ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ৩ যিলহজ্জ ১৪৩২ হিজরি | ৩১ ঈখা, ১৩৯০ হি. শা. | ৩১ অক্টোবর, ২০১১ ঈসাব্দ

عید مبارک

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Member | REHAB

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

ঈদ মুবারক

ইসলামে রয়েছে তিন ঈদ–এক হলো জুমুআর দিন, দ্বিতীয় হলো ঈদুল ফিতর, তৃতীয় হলো ঈদুল আযহিয়া। ঈদুল আযহিয়া বড় ঈদ বলে পরিচিত কারণ এটি কুরবানীর ঈদ।

হজ্জ সংক্রান্ত ইবাদত আরম্ভ হয় হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সময়ে, (সূরা হজ্জ)। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদা তাআলার আদেশে তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈলকে জনশূন্য তরুলতাহীন মক্কার মরু প্রান্তরে ছেড়ে যান, যেখানে জীবন যাপনের কিছুই ছিল না। এটি সেই স্বপ্নের বাস্তব উপস্থাপন ছিল, যাতে তিনি (আ.) নিজ পুত্রকে জবাই করতে দেখেছিলেন। খোদা তাআলা পুত্র কুরবানীর স্থলে বাহ্যিকভাবে তখন পশু কুরবানীর আদেশ করলেন যদিও এর পূর্বে নরবলি'র কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'প্রথম মানুষ ওয়াক্‌ফ' যা খোদার পথে উৎসর্গ করা হয়েছিল। খোদা তাআলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে তাঁর মৃত্যুর পর এমন এক নব জীবন দিলেন যে তাঁর প্রজন্ম ধারায় বিশ্ব ধর্ম বিধানের বাহক, শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান, নবী গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঘটলো। হজ্জ পালনকালে পশু কুরবানী হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর একটা বাহ্যিক চিহ্ন হলেও এদ্বারা এই অতুলনীয় সেই কুরবানীর স্মৃতি চিরদিন অম্লান রয়ে গেল। তাঁর পবিত্র বংশ–বাহ্যিক ভাবে বিরান মক্কা উপত্যকায় সেই অনুপম ফল দান করলো, যার ফুঁৎকারে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা সজীব হলো, আজও সজীব আছে এবং চিরকাল সঞ্জীবিত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আযহিয়ার কুরবানী হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (রা.) এর কুরবানীর স্মৃতিকে সচল রাখে। কিন্তু আফসোস! জড়োন্নতির এ যুগে আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের এই কালে মানুষ এই মহান কুরবানীর স্মৃতিকে অনুষ্ঠান সর্বস্বে পরিণত করেছে।

ঈদুল আযহিয়ার নামায আদায় শেষে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর রীতি মোতাবেক পশু জবাই করে শরীয়তের বিধান মতে এর গোশত বন্টন করাই হলো ইবাদত। হযরত রসূল করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবনে এরকম ঈদই পালিত হয়েছে।ওই রূপ ঈদ পালনই মানুষের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা ও তাক্‌ওয়া হাসিলের কারণ হয়। এতে পরস্পরের মাঝে ঈমানী-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর হয়ে স্বর্গীয় এক পরিবেশে চরম ও পরম আনন্দ অনুভব হয়, আর এটার নামই প্রকৃত ঈদ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে না তাদের জন্য এটা ঈদ নয়। তাদের জন্য এ কেবল হৈ-হুল্লা ও মেলা বৈ কিছু নয়।

খোদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত অর্থে ঈদুল আযহিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইবরাহীমি কুরবানীকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন। আমীন!

সেই সাথে মহান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিশেষ শুকরিয়া আদায় করি যে তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের মাঝে খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া আহমদীয়া-র নিয়ামত শত বছরাধিক কাল ধরে জারি রেখে আমাদের বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! আমাদের বিনীত দোয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর আশিসময় ছায়া আমাদের ওপর সদা বিরাজমান থাকুক আর আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলাম বিস্তার লাভ করে জগৎময় শান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে পরুক।

সবাইকে **ঈদ মুবারক**

mPxc Î

৩১ অক্টোবর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১৪ অক্টোবর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
১৭ নভেম্বর ২০১০-এ প্রদত্ত **ঈদুল আযহা খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
'আল ওয়াছে' এবং প্রসারমান বিশ্ব [মূল : মোহাম্মদ জিয়া এইচ শাহ্ ও মোহাম্মদ লুৎফর রহমান] অনুবাদ : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৭
ধর্ম বনাম রাজনীতি কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী	২০
আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও ঈদুল আযহিয়া মাহমুদ আহমদ সুমন	২৩
খিলাফতই ঐক্যের একমাত্র পথ মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৬
হযরত ইব্রাহীম (আ.)-ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কুরবানী এনামুল হক রনি	২৮
ইসলামে জেহাদ সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩০
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** **খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী**	৩২
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হজ্জ-২২

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি, তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে, তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এগুলোর মাংস ও রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর সমুজ্জলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে না, বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাক্ওয়ার প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাক্ওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন প্রিয় যা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয়-ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ তাআলা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট চান না এবং আশা করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, বাহ্যিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সে জন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এও সত্য, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোলসস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ এর শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক

❑ হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

❑ হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ)।

❑ হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঈদে ধুসর রঙ্গের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি এদেরকে আপন হাতে জবাই করলেন এবং (যবাই করার সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (যবাই করার সময়ে) উহাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে দেখেছি (মুত্তাফিক আলায়হে)।

❑ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছর বয়সী বাচ্চা-ছাগল বাকী থাকল। তিনি তা রসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর বল্লেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে , আমি বল্লাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (মুত্তাফিক আলায়হে)।

❑ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই যবাই করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

❑ হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে) । অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাঁটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাঁটে (মুসলিম)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন কুরবানী না করি যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পাছের দিকে ফিরে গেছে তার দ্বারা (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা দ্বারা কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই কুরবানী কী? হুযূর উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের সুন্নত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে, তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকট না আসে।'

অমৃতবাণী

একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আরো একটি উপাসনার নাম হজ্জ। যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়। একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)।

"ক্বা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী আইনে হজ্জের প্রকৃত অর্থ এটাই" ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদের হাজী বলুক এ জন্যই অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না কেননা তারা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, এই মাস ত্যাগের মাস বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র" (মলফুযাত, ২য় খন্ড)

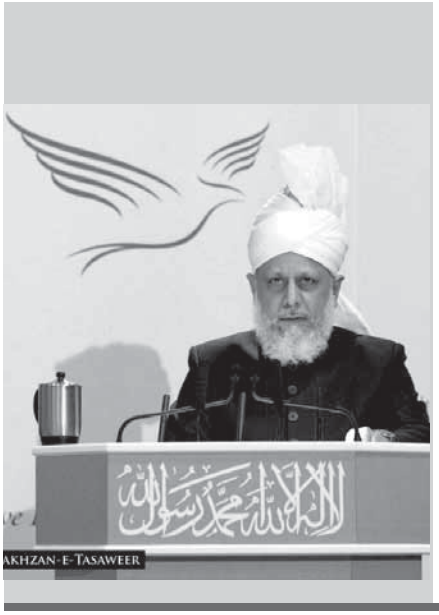

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক হল্যান্ডের নূনস্পীটস্থ মসজিদ নূর-এ প্রদত্ত ১৪ অক্টোবর ২০১১-এর (১৪ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ آمِيْن

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ অতিবাহিত করছি। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা আহমদীরা এ নিশ্চিত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে চলছেন। বিশেষ করে মানুষকে খোদা বানিয়ে রাখার খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আহমদীয়া জামাত যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে আর ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে সোচ্চার– অন্য কোন মুসলমান ফির্কা এর কোটি ভাগের এক ভাগও উপস্থাপন করছে না আর না-ই উপস্থাপন করার ক্ষমতা রাখে।

কেননা একাজ আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী এবং তাঁর জামাতের মাধ্যমে করানোর ছিল এবং করাচ্ছেন। খ্রিস্টান জগত আজ এ কথা স্বীকার করছে। পুণ্য প্রকৃতির মুসলমানরাও একথা স্বীকার করে যে আহমদীয়াতেই প্রকৃত হিদায়াত নিহিত এবং এর মাধ্যমেই তারা হিদায়াতের পথ খুঁজে পাচ্ছে। তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন খ্রিস্টান পাদ্রীরা এই ধ্বনি উত্তোলন করছিল, অচিরেই আফ্রিকাবাসীরা খ্রিস্টীয় মতবাদ গ্রহণ করে খোদার পুত্রের ঈশ্বরত্বকে মেনে নেবে। অনুরূপভাবে আজ থেকে একশ বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছিল, অচিরেই খ্রিস্ট ধর্ম ভারতবর্ষে জয়যুক্ত হবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মানুষকে খোদা বানানোর মতবাদকে স্বয়ং তাদের পুস্তক ও যুক্তিতর্ক দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণ করেন তখন লক্ষ লক্ষ মুসলমান যারা খ্রিস্ট ধর্মের ঝুলিতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল বা খ্রিস্ট ধর্মকে ইসলামের চাইতে শ্রেয় জ্ঞান করতো তাঁরা সম্ভিত ফিরে পেল এবং এই মিথ্যা মতবাদকে গ্রহণ করা থেকে রক্ষা পেল। তিনি (আ.) [অকাট্য যুক্তি প্রমাণের] এক সুদৃঢ় প্রাচীর ও প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে খোদার একত্ববাদ এবং ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব জগদ্বাসীর সামনে প্রমাণ করে দিলেন।

এভাবে আফ্রিকাতেও আহমদীয়া জামাতের মুবাল্লেগণ ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদরূপী মিথ্যা মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে খ্রিস্টান প্রচারকদের সামনে এক প্রতিবন্ধক দেয়াল গড়ে তুলেন। ফলে তারা একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, আহমদীরা আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত ইসলামের এই বীর সেনানীর এরূপ (মহান) অভিযান দেখা সত্ত্বেও মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেণী আনন্দে মাতোয়ারা হবার পরিবর্তে এবং জামাতভূক্ত হবার পরিবর্তে ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষের যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে তাথেকে আল্লাহ্ই রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, খোদার সিদ্ধান্ত তাঁর প্রেরিতের অনুকূলে আছে এবং থাকবে। পুণ্য স্বভাবের লোকেরা ধীরে ধীরে মুহাম্মদী মসীহ্‌র জামাভূক্ত হয়েছেন এবং হচ্ছেন, তবে অধিকাংশ মানুষ মোল্লাদের ভয় এবং অল্প বিদ্যার কারণে চরম বিরোধিতা করে চলছে।

প্রতিদিনই মুসলমান নামধারী দেশগুলোতে বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে কোন না কোন অপতৎপরতা চালানো হয়ে থাকে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলও এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে যার (অনুষ্ঠানাদি) ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও শোনা ও দেখা যায়। অল্পজ্ঞানী মুসলমানদেরকে ভুল কথা বলে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হয়। কোন কোন টিভি চ্যানেল তাদের নির্ধারিত নীতির কারণে এর অনুমতি দেয় না। তবে, জনকল্যাণকর কাজের নামে সময় ক্রয় করে এসব চরমপন্থী ও নৈরাজ্যবাদীরা এতে কোন না কোন কথার অজুহাতে ঘোষণা করে দেয়, আহমদীরা 'ওয়াজেবুল কতল' (অবশ্য হত্যাযোগ্য)।

সম্প্রতি এখানে ইউরোপের এমনই একটি চ্যানেলে এক মৌলভী উক্ত ঘোষণা দিয়ে বসে। পরে ঐ চ্যানেলের মালিকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং এই চ্যানেলে ভবিষ্যতে ঐ মৌলভীকে আর সুযোগ না দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

যাহোক, ঐ সব মন্দ স্বভাবের লোকেরা ইসলাম, রসূল (সা.)-এর সম্মান এবং খতমে নবুয়তের নামে স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদের প্ররোচিত করার কাজ হাতে নিয়েছে। আমি যেমন বললাম, ইসলামের প্রচার ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যিকার মর্যাদা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা আহমদীয়া জামাত যেভাবে করে চলছে তার স্বীকৃতি ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এবং মিশনারীরা পর্যন্ত দিচ্ছে। মুসলমান হওয়ার দাবীদার এবং আমাদের বিরুদ্ধে এসব আপত্তিকারীদের ইসলাম প্রচারের জন্য মাত্র কয়েক টাকা খরচ করারও সাধ্য নেই। তবে, দেশের সম্পদ লুটে নেয়ার ধান্দা অবশ্য সবারই আছে। আজ ইসলাম এবং রসূল (সা.)-এর সম্মানের নামে (পাকিস্তানে) দেশে যা কিছু হচ্ছে, সেখানে যে ধরনের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে তা ভদ্র সমাজকে অস্থির করে তুলেছে। কারো জীবন সেখানে নিরাপদ নয়।

আহমদীদের বিরুদ্ধেতো সন্ত্রাস চলছেই, আর আমি অনেকবার এর উল্লেখও করেছি। আহমদীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তানের কোন নাগরিকই এখন এর কবল থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তারা ভাবে না, একদিকে দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে, কোন শাসন ব্যবস্থা নেই, অপর দিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশকে ঘিরে ফেলেছে। এ সব কি হচ্ছে? জাতি কোন দিকে যাচ্ছে? আল্লাহ্ কোন পরিণামের দিকে এদের নিয়ে যাচ্ছেন? কি পরিণাম হতে যাচ্ছে এদের?

আল্লাহ্ তা'লা এদের কান্ডজ্ঞান দিন, এরা চিন্তা করে দেখুক আর ভাবতে শিখুক। আহমদীরা তো দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে এই দোয়া করে, আল্লাহ্ দেশকে সকল প্রকার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন, যদিও বিভিন্ন ধরনের আইনের ছত্রছায়ায় তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে আর তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। **গত জুমুআর খুতবায় আমি দোয়া ও প্রত্যেক সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখার কথা বলেছিলাম। এ প্রসঙ্গে বলছি, এ রোযা জামাতবদ্ধ ভাবে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের সবাই সম্মিলিতভাবে একই দিনে এ রোযা রাখবে। প্রত্যেক স্থানীয় জামাত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে তাঁরা কোন দিন রোযা রাখবে। সোমবার বা বৃহস্পতিবার রোযা রাখা যেতে পারে। আমি পাকিস্তানের জামাত গুলোকে একথাই বলেছিলাম। মোটকথা, আমি যে তাহরীক করেছি এর প্রতি জামাতের পুরো মনোযোগ দেয়া উচিত।**

আমি জামাতকে দোয়ার জন্য বলেছিলাম, যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জামাতকে শত্রুর শত্রুতা থেকে এবং অত্যাচারীদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করেন। দেশের জন্যও দোয়া করতে বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা নৈরাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করুন যাতে দেশ রক্ষা পায়। আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি। তাইতো দেশে এসব অরাজকতা দেখে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। মোটকথা এই কর্তব্য পালন আমাদের জন্য, প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর জন্য আবশ্যক, তাকে সে কর্তব্য পালন করতেই হবে।

এবার আমি প্রথম কথায় ফিরে আসছি। আমি বলেছিলাম, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মাধ্যমে হিদায়াতপ্রাপ্ত জামাতের সদস্যরাই ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং সকল ধর্মের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ জন্যই আফ্রিকা হোক বা ইউরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলই হোক না কেন ইসলামের সুরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম আহমদীরাই নির্ভীকভাবে দন্ডায়মান হয়। কেবল সুরক্ষার জন্যই নয় বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যেও তারা দাঁড়ায়। যেখানে তেল সম্পদ কোন কাজে লাগে না সেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আহমদীদের সামান্য আয় হতে প্রদেয় চাঁদা কাজে আসে।

নিঃসন্দেহে এতে আমাদের কৃতিত্ব ও গর্বের কিছু নেই। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ মাত্র যে তিনি আমাদের যৎসামান্য ত্যাগে প্রভূত কল্যাণ দান করেন এবং এর প্রভূত ফল আসে। কাজেই আমাদের উচিত, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসাকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের এ সামান্য ত্যাগ-তিতিক্ষা তাঁর সমীপে উপস্থাপন করে যাওয়া। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে আহমদী হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। আর আমাদের পূর্বপুরুষকে সেই সৌভাগ্য দান করে থাকলে আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যুগ ইমামের সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর মিশন পূর্ণ করার চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের ইহ ও পরজগতকে আমরা যেন সুনিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! কেবল আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং আমাদের নিজেদের ভেতর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী হৃদয় সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই বাণী যা আসলে প্রকৃত ইসালামের বাণী, স্ব-স্ব দেশে প্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। আর ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ দূর করে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

কাজেই একটি ছোট্ট জামাত হওয়া সত্ত্বেও হল্যান্ড জামাতকে নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। হাতে গোনা কয়েকজন কাজ করলেই এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়া সম্ভব নয়। হল্যান্ডে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীকে তার পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করতে হবে। হল্যান্ডই সেই দেশ যেখানে সেই দুর্ভাগাও বসবাস করে যে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন কথাবার্তা বলা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় সীমাতিক্রম করছে।

হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ইসলামের নাম শুনতেই রাগে তাদের মুখ থেকে ফেনা বের হওয়া শুরু হয়। কিছুদিন পূর্বে যখন মুসলমান কোন একটি সংগঠন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কঠোর নিন্দা করে তখন গীরট উইল্ডার (এববৎঃ ডরষফবৎ) নামী এই নিপীড়ক ঘোষণা দেয়, এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং আমরা ততক্ষণ মানবো না যতক্ষণ এ ঘোষণা না দেবে যে, ইসলাম ধর্মই মৌলবাদের শিক্ষা দেয়। এ ধর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয় বরং মিথ্যা, কাজেই একে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করা উচিত। এ হল তার অভিপ্রায়। সে বলেছে, এ ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কোন প্রকার অজুহাত শুনতে প্রস্তুত নই। অতএব আমাদের এই দ্ব্যর্থহীন বাণী শুনাতে হবে, হে অত্যাচারী! শুনে রাখ– তুমি, তোমার দল এবং তোমার সমমনা ব্যক্তিরা ধ্বংস হবে ঠিকই কিন্তু ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ

মুস্তফা (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এসেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আর পৃথিবীর এমন কোন শক্তি, সে যত বড় ফেরাউন আর ইসলামের শত্রুই হোক না কেন ইসলামের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে সেই জারীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র বীর)-কে প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের মত শত্রুদের চরম শত্রুতা সত্ত্বেও এ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাহায্যে ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। খোদার এই পাহলোয়ানের হাতে বয়আতকারী প্রত্যেক আহমদী জানে এবং এ প্রতিজ্ঞা করে, আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ ও সময়ের ত্যাগ স্বীকার করে এ লক্ষ্য অর্জন করবই, ইনশাআল্লাহ্।

কাজেই এ দেশের অধিবাসী ও পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীকে বিশ্ববাসীর কাছে এ বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আপনাদের এ বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এই রাজনীতিবিদ ও ইসলামের ঘোরতর শত্রু সংসদে আসন লাভ করলেও আর পূর্বের চেয়ে অধিক আসনও যদি লাভ করে করুক; কিন্তু বিশ্ববাসীকে আপনারা বলে দিন, তাদের এসব আচরণই খোদা তা'লার হাতে তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। খোদা তা'লা সর্বদা তাঁর রসূলের লাজ রেখেছেন, তাঁর মর্যাদার সুরক্ষা করেছেন আর আজও করবেন– ইনশাআল্লাহ্। আমাদের কোন ক্ষমতা নেই আর আমরা পার্থিব কোন কৌশলও অবলম্বন করব না কিন্তু যাদের হৃদয়ে আঘাত করা হয়, তাদের ব্যাকুল দোয়া আল্লাহ্ তা'লার আরশ কাঁপিয়ে দেয়। আর এখানে তো আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন ও বন্ধুর প্রশ্ন।

এখানে আমাদের দোয়ার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানই সেই কাজ দেখাবে যে, এসব নীচদের দেহকনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। হল্যান্ডে এমন বহু লোক আছেন যারা সাধু প্রকৃতির, সবাই এক স্বভাবের নয়। তাঁরা এ দুষ্ট লোকের কথা প্রত্যাখ্যান করেন। সে কারণেই এই হতভাগার বিরুদ্ধে এখানে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল। অবশ্য ধারণা করা হয়, এই মোকদ্দমাও রাজনীতির শিকার হয়েছে; এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এমন ভদ্র মানুষ অবশ্যই এদেশে আছেন যাঁরা এদের এ ধরনের ঘৃণ্য চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডে অসন্তুষ্ট। এসব লোকদের সন্ধান করে তাদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর বাণী পৌঁছান। পৃথিবীতে শান্তি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠাকারীদের সন্ধান করুন। এরপর তাদেরকে জগতে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সাবধান করুন। পরস্পরের অনুভূতির ব্যাপারে সংবেদনশীল এবং অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের একত্রিত করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার অভিযান পরিচালনা করুন। বিশ্ববাসীকে বলুন, আজ ইসলাম সবচেয়ে অধিক এই শিক্ষা দেয় যে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান কর। এমনকি শির্ক যা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পাপ, এতে লিপ্তদের দৃষ্টিতে রেখে এ শিক্ষা দিয়েছে, তাদের প্রতিমাকেও গালমন্দ করো না। কেননা প্রত্যুত্তরে তাঁরা খোদার সম্পর্কেও কটু কথা বলবে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়াবে।

অতএব আজ হল্যান্ডের আহমদীদের নিজেদের প্রচেষ্টাকে বেগবান করা খুবই প্রয়োজন। আজ আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হতেন যেভাবে বহুদিন থেকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাহলে আলমীরে'তে যেখানে মসজিদ বানাতে চেয়েছিলেন, সরকার মসজিদের জমি দিয়ে পুনরায় তা ফেরত নিত না। এটা ঠিক, এটি ইসলামের শত্রুদের ঘাঁটি, এখানে তাদের রাজত্ব। কিন্তু তবুও এখানে অনেক সৎ-প্রকৃতির মানুষ আছেন যারা আপনাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কাজেই নিজেদের প্রচেষ্টা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগঠিত, সুদৃঢ় ও বেগবান করা প্রয়োজন। সাথে সাথে সর্বদা এটাও স্বরণ রাখুন, আমাদের কোন কাজ দোয়া ছাড়া হয় না। খোদা তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দিন। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলব, দেশের (হল্যান্ডের) রানীর জন্য দোয়া করুন। কেননা রানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধিতা করে থাকেন এবং তিনি মুসলমানদেরকে দেশের নাগরিক জ্ঞান করে তাদের অধিকার ও অনুভূতীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা বলেন। তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার জন্য সমাজের একটি শ্রেণী তাঁর পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে। মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহের মাধ্যমে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাই রানীর জন্য দোয়া করুন, তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্র যেন ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হৃদয় দুয়ার খুলে দেন। অনুরূপভাবে দেশের লোকদের বক্ষকেও উন্মুক্ত করে দিন যাতে তাঁরা ইসলামের অনুপম শিক্ষাকে অনুধাবন করতে পারে।

অতএব আমাদেরকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের নাম সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজেদের পূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা আমরা খোদার সেই বীর পুরুষকে মেনেছি যিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করবেন। বিশ্ববাসীকে তাঁর (সা.) পদানত করবেন। যেমন আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই এ উপমহাদেশে মিথ্যার আগ্রাসন প্রতিহত করেছেন। এ উপমহাদেশের মুসলমানরা তা মানুক বা না মানুক, তিনিই মুসলমানদেরকে শির্কের ঝুলিতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠায় নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।

এছাড়া আফ্রিকাতে আমাদের মুবাল্লেগগণ ইসলাম প্রচার করে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী লোকদেরকে একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। জলসায় আমরা আফ্রিকান আহমদীদেরকে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'র** গান গাইতে শুনি। তাদের মধ্যে অধিকাংশই খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ঘানায় অধিকাংশ আহমদীই তাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম থেকে এসেছেন। কাজেই এটি সেই কাজ যা আজ আহমদীয়া জামাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে শিখে জগতময় করে যাচ্ছে। আজকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) থেকে পৃথক হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

কেননা তিনি (আ.)-ই আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরিত সেই মাহদী যিনি এ যুগে বিশ্ববাসীর পথনির্দেশনার কাজ করবেন আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে এসেছেন। তিনিই মহানবী (সা.)-এর সেই প্রকৃত প্রেমিক যিনি নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎসর্গ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

হৃদয়ে রসূল প্রেম এমন প্রবল ছিল যার ধারণা তাঁর রচনাবলী থেকে করা যায়। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন:

'এখন আকাশের নীচে কেবল একজনই নবী এবং একটিই ঐশী গ্রন্থ বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। যিনি সব নবীর চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ, আর সকল রসূলের চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ এবং যিনি হলেন খাতামুন্ নবীঈন ও মানবশ্রেষ্ঠ। যাঁর অনুসরণে খোদাপ্রাপ্তি ঘটে আর আঁধাররাজি দূরীভূত হয় আর এ জগতেই সত্যিকার মুক্তি লাভের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়। (বারাহীনে আহমদীয়া পৃষ্ঠা: ৫৭৫)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রীকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায় সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এ প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর যেমনটি দুনিয়া সৃষ্টি অবধি তুমি অন্য কারও প্রতি কর নি'। (ইতমামুল হুজ্জত, পৃষ্ঠা: ৩৬)**

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **'যারা খোদাভীতির তোয়াক্কা না করে অন্যায়ভাবে আমাদের সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কটুক্তি করে এবং তাঁর প্রতি ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে এবং বাজে কথা বলা থেকে বিরত হয় না তাদের সাথে আমরা কীভাবে মিমাংসা করতে পারি। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমরা জঙ্গলের সাপ এবং অরণ্যের নেকড়ের সাথে সন্ধি করতে পারি কিন্তু যারা আমাদের নবী (সা.), যিনি আমাদের কাছে আপন প্রাণ এবং পিতা-মাতার চেয়েও অধিক প্রিয় তাঁর প্রতি অপবিত্র আক্রমণ করে তাদের সাথে সমঝোতা করতে পারি না। খোদা তা'লা আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দিন। আমরা এমন কাজ করতে পারি না যার ফলে ঈমান হারানোর উপক্রম হয়'।**

কাজেই এ যুগে এমন কেউ কি আছে, যিনি এভাবে মুহাম্মদ প্রেম, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য আত্মভিমান প্রদর্শন করবেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছাড়া আর কাউকে দেখা যাবে না। ধরাপৃষ্ঠে খুঁজে দেখ! কোথাও রসূলের এমন নিষ্ঠাবান প্রেমিক খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলমানদের একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণীর দুর্ভাগ্য, তাঁরা এই রসূল প্রেমিককে শুধু অস্বীকার করেই নিবৃত্ত হয় নি বরং অন্যায়ভাবে তাঁকে গালি-গালাজের লক্ষবস্তুতে পরিণত করা হয়।

যেভাবে আমি বলেছি, পাকিস্তানে মোল্লারা প্রায়শঃ এমন অনুষ্ঠান করে থাকে। রাবওয়াতে যেখানে ৯৮ভাগ আহমদীদের বসতি, সেখানকার আহমদীদের জলসা এবং ইজতেমা করার অনুমতি নেই। কিন্তু খতমে নবুয়ত-এর নামে শত্রুদেরকে আহমদীদের বিরুদ্ধে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরাভাষা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। অক্টোবরে তারা রাবওয়াতে যে জলসা করে তা গতকাল অপরাহ্নে আরম্ভ হয়েছে আর আজ বিকেলে শেষ হবার কথা।

প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে সেখানে রসূল প্রেমের কথা খুব কমই হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অপালাপ এবং নোংরা কথাবার্তার বেসাতি চলছে। খতমে নবুয়তের নামে এই রসূল প্রেমিক অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে (আক্রমনের) লক্ষস্থল বানানো হচ্ছে। তাঁর অনুসারীদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এ সবকিছু রসূল প্রেমের কারণেই সহ্য করি আর আমরা আমাদের প্রিয় খোদার সামনে বিনত হই যিনি আমাদেরকে কখনও পরিত্যাগ করেন নি।

আমাদের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা যৎসামান্য হলেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় মসীহ্ ও মাহদীর সত্যতা প্রমাণের জন্য অসংখ্য মানুষকে স্বয়ং পথ দেখিয়েছেন। আর এ কাজ বিগত ১২৫ বছর ধরে তিনি করে যাচ্ছেন। তাদের হৃদয় দুয়ার খুলেন এবং তাদেরকে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্যও দান করে চলেছেন। এখন আমি আপনাদের সামনে আপনাদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য কতক ঘটনা উপস্থাপন করব।

আমাদের জার্মানীর মুবাল্লেগ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব লিখেন, এক অ-আহমদী বন্ধু সারবাদ বাশ সাহেব বেশ কয়েক বছর ধরে আমার যেরে তবলীগ ছিলেন। তিনি জামাতের বিশ্বাস বা আক্বীদাকে সবদিক থেকে সঠিক জ্ঞান করতেন কিন্তু বয়আতের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। তিনি তবলীগও করতেন আর তাঁর তবলীগের ফলে কয়েকজন বয়আতও করেছেন কিন্তু নিজে বয়আত করেন নি।

আহমদীয়াতের তবলীগ করতেন। বলতেন, এখনও কিছু সংশয় আছে। মুরব্বী সাহেব লিখেন, একদিন তিনি আমার কাছে এসে বললেন, বয়আত করার নিয়ম কী? আমি অবাক হয়ে বলি, কী হয়েছে? তিনি বলেন, রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যাতে এই শব্দ শুনতে পাই, আহমদীয়াত সেই সমুদ্র যার ধনভান্ডারের সন্ধান পাওয়া যার তার কাজ নয়। তিনি বলেন, এই শব্দ আমার অন্তরাত্মাকে বদলে দিয়েছে। কাজেই তিনি তখনই বয়আত গ্রহণ করেন।

আইভরিকোস্ট-এর সোসিয়াবে নামক গ্রামে আমাদের মুবাল্লেগ তবলীগের উদ্দেশ্যে যান এবং ইমাম মাহদীর আগমনের ঘোষণা করেন। সেই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চিবাতে সাহেব দাঁড়িয়ে নিজের একটি স্বপ্ন শোনান; এক রাতে তিনি প্রায় ২টার দিকে উত্তর দিগন্তে একটি আলো জ্বলজ্বল করতে দেখেন এবং এর এক সপ্তাহ পর একটি আলো দক্ষিণ দিগন্তে উদিত হতে দেখেন। গ্রাম প্রধান তাঁর এই স্বপ্ন আলেমদের সামনে বর্ণনা করলে তাঁরা উত্তর দেয়, তুমি অনেক বড় সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছ।

এই স্বপ্নের কিছুদিন পর যখন আহমদী মুবাল্লেগণ সেই গ্রামে পৌঁছায় এবং ইমাম মাহদীর সংবাদ তাদের শুনানো হয় তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মানুষের সামনে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এটিই সেই মহাসৌভাগ্য যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তে উদিত আলোর আকারে দিয়েছেন। আমি সত্যকে গ্রহণ করছি। তিনি তাঁর গ্রামবাসীকে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা গ্রহণ করতে চাও তাদেরকে আশ্বস্ত করছি আহমদীয়াত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত সৌভাগ্য একে লুফে নাও। এরপর প্রায় পুরো গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

এরপর ইরাকের ওয়াহীদ মুরাদ সাহেব বলেন, আমি শিয়া অধ্যুষিত এলাকায় বাস

করি। আমার বাপ-দাদাও শিয়া কিন্তু ইমাম মাহদীর ব্যাপারে শিয়া মতবাদ সম্পর্কে আমার সংশয় ছিল। মনে হতো, অবশ্যই কোথাও কোন না কোন ফাক বা ত্রুটি রয়েছে। একদিন স্বপ্নে দেখি, আমি একটি ঘরে বসে আছি, তখনই চারজন মানুষ আসার শব্দ পেলাম যাদের আমি চিনতাম না। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারজনই পানির পাইপ দিয়ে আমার ঘরে পানি ছিটাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি করছো? তাঁরা বললো, আমাদেরকে আপনার ঘর পরিস্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্যান্য প্রতিবেশীর ব্যাপারে কী নির্দেশ? তারা অথবা তিনি বললেন, আমাদেরকে কেবল আপনার ঘর পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বপ্ন দেখার পরের দিন টিভি চালু করে দেখলাম টিভির পর্দায় চারব্যক্তি যথাক্রমে মুস্তফা সাবেত সাহেব, শরীফ সাহেব, হানী সাহেব ও মু'মিন সাহেব আল্ হেওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠানে বসে আছেন। আমি নিশ্চিত হলাম, এ স্বপ্ন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কাজেই আমার বয়আত করা উচিত।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লিখেন, রিইউনিয়ন দ্বীপের একজন মহিলা একটি মিটিং এর উদ্দেশ্যে ফ্রান্স যাচ্ছিলেন। যাবার পূর্বে তাঁকে স্বপ্নে বলা হল, আপনি ফ্রান্সে গিয়ে আপনার আত্মীয় 'এল এম' এর সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবেন।

তিনি ফ্রান্সে গিয়ে উক্ত আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত করলেন যিনি আল্লাহ্‌র কৃপায় পূর্বেই বয়আত করেছিলেন। তিনি ঐ মহিলাকে মিশন হাউজে নিয়ে যান। তবলীগ করার পর ঐ মহিলা বয়আত করেন। পরবর্তী দিন ঐ মহিলাকে বিমান বন্দরে ছেড়ে আসার জন্য তার অবস্থান স্থলে পৌঁছলে সেখানে তার স্বামী-সন্তান উভয় উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, আমরা আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। আপনি আমাদের বয়আত নিন। এভাবে সেই পরিবারের সবাই বয়আত গ্রহণ করেন।

এরপর মিশর থেকে আব্দুল মজীদ সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি একটি ছোট্ট নৌকায় আরোহিত। আমার হাতে একটি বৈঠা এবং আমি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমতাবস্থায় সমুদ্রে প্রচন্ড ঝড়-তুফান আরম্ভ হয় এবং নৌকা উল্টে যাবার উপক্রম হয় তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার বাণী শুনলাম 'এই নাও মূসার লাঠি এবং সমুদ্রে আঘাত কর'। এমন সময় একটি বাঁকা লাঠি হাতের কাছে পাই। আমি তা হাতে নিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলাম। ইতিমধ্যে নৌকা একটি উঁচু স্থানে অবস্থান নিল যা অতি চমৎকার অট্টালিকা বিশিষ্ট একটি শহর ছিল। এ শহরের প্রত্যেকটি মানুষ খুবই সুদর্শন ও আনন্দিত। আমাকে বলা হল, এটি আহমদীয়া জামাতের শহর। আমি বুঝলাম, এখানে ইশারা করা হয়েছে তাই আমার বয়আত করা উচিত। কাজেই এভাবে আমার বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য হল।

আরশাদ সাহেব ২০০০ সালের একটি ঘটনা লিখেন, জার্মানীর একটি তবলীগি স্টলে তুর্কী বংশদ্ভুত একটি পরিবারের সাথে পরিচয় হয়। পরবর্তীতে সে দম্পতি আমাদের মসজিদে আসেন। সেই তুর্কী মহিলা যখন আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবের স্ত্রীকে দেখেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো আর তিনি বললেন, কয়েকদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আপনি আমাকে তবলীগ করছেন। তখন তাকে আহমদীয়াতের ব্যাপারে বুঝানো হল। এমটিএ'তে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে দেখেন।

কয়েকদিন পর তিনি পুনরায় মসজিদে এসে বলেন, আমি বাসায় গিয়ে নিজস্ব রীতি অনুসারে দোয়া করেছি, 'হে আল্লাহ্ এটি আমার জন্য একটি রহস্য'। তুমি আমাকে সাহায্য কর। ঐ বুযূর্গ যাকে আজ আমি মসজিদের টিভি'তে দেখেছি তিনি যদি সত্য হন তবে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দাও। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, কাশফী অবস্থায় (দিব্য দর্শনে) তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। এরপর উক্ত স্বপ্নের ফলশ্রুতিতে সেই পরিবারের তিনজনই বয়আত গ্রহণ করেন।

এরপর হল্যান্ডেই, যেখানে কেবল মুসলমান নয় বরং অ-মুসলিমদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করেন। হল্যান্ড থেকে আপনাদের মুবাল্লেগ সাহেব আমাকে লিখেন, এক হিন্দু মহিলার নাম হলো মালতী। তিনি প্রায় পনের বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মরক্কোর অধিবাসী ইউসূফ মানসুরুল্লাহ্'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর ঐ মহিলা স্বপ্নে দেখেন, ভারতের বিভিন্ন এলাকার মানুষ, সাদা রঙ এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় এক বুযূর্গের পাশে সমবেত হচ্ছে এবং তারা হাতের ইশারায় বলছে, এই ব্যক্তি মসীহ্ মওউদ। ঐ মহিলা স্বামীকে তার স্বপ্ন শুনান। তার স্বামী এমটিএ দেখলেন যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল।

মনসুর বিল্লাহ্ সাহেব তার স্ত্রী'কে ডেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো মাত্রই তিনি চিনে ফেলেন আর বলেন ইনিই সেই পবিত্র পুরুষ যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। তাঁরা দু'জন এমটিএ দেখেন এবং বয়আত করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এসব পবিত্রচেতা মানুষ! যারা আহমদীয়া জামাতভূক্ত হন এখন জামাদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে জামাতী রীতিনীতি ও আদর্শে সুশিক্ষিত করা, এমন লোকদের কাছে টেনে আনার জন্য তাদের সাথে স্থায়ী যোগাযোগ রক্ষা করা আবশ্যক।

এবার খ্রিস্টানদের অবস্থা দেখুন! **বারিন্ডীভিলসন** নামের একজন মহিলার আহমদীয়াত গ্রহণের বিবরণ দিতে গিয়ে কানাডার আমীর সাহেব লিখেন, টরেন্টোতে বসবাসকারী এই যুবতী আমাদের একজন প্রচারক হাসান ফারুক সাহেবের পরিচিত ছিলেন। তিনি একাধারে আল্লাহ্ তা'লা, মহানবী (সা.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন। তাঁরা তাকে (ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে) নিশ্চয়তা দেন এবং ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানান। এরপর তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

আবার কানাডাতেই আমানুয়েল রোচেস'এর বয়আত গ্রহণের ঘটনা আছে। অন্টারিও'তে বসবাসকারী চব্বিশ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ যুবক শৈশবে স্বপ্নে আলো দেখতে পেতেন। প্রথম প্রথম তা অনুজ্জ্বল বা নিষ্প্রভ দেখা যেত কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। দেড় বছর পূর্বে এই যুবক যখন মুসলমান হয় তখন এ আলো আরও উজ্জ্বল হয়। আর আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণার সময় অধিক দীপ্তিময় হতে থাকে আর এভাবে আলোর মাঝে তিনি

অস্পষ্ট একটি অবয়ব দেখতে আরম্ভ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন এক আহমদী বন্ধুর সাথে তিন চার ঘন্টা আলোচনার পর রাতে স্বপ্নে একটি সুস্পষ্ট চেহারা দেখেন। বিলম্ব না করে তিনি সেই আহমদী বন্ধুকে এ বিষয়টি জানান। তিনি তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ছবি অথবা হতে পারে অন্য খলীফাদের ছবি দেখান। কিন্তু আমার ছবি (পঞ্চম খলীফা) দেখা মাত্রই তিনি বলে উঠেন, এটিই সেই চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছি। অতঃপর ২০১১ সালের মার্চে তিনি বয়আত করেন।

ইউগান্ডার আমীর সাহেব লিখেন, তবলীগের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিনিধিরা যখন এক ঘরে আহমদীয়াতের বার্তা নিয়ে যান তখন খ্রিস্টান গৃহবাসী আমাদের প্রতিনিধিকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আপনাদেরই অপেক্ষা করছি। কেননা আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, কতক মুসলমান আছেন যারা বিভিন্ন ফির্কা ও গোত্রের লোকদেরকে এক খোদা ও মসীহ্‌র দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ দেয়ার জন্য সমবেত করছেন।

আপনারা আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন। আমার বয়আত নিন। এ কথায় আমাদের প্রতিনিধিরা বলেন, বয়আত ফরম পড়ে নিন এবং বয়আতের বিষয়টি প্রথমে ভালোভাবে বুঝে নিন। তখন ঐ খ্রিস্টান (ভদ্রলোক) বললেন, আমি তো পূর্বেই ঈমান এনেছি, আমাকে আর বিলম্ব করাবেন না। এরপর তিনি তখনই স্বপরিবারে বয়আত গ্রহণ করেন।

সিয়েরালিওনের আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, লুঙ্গী'র মাধ্যমিক স্কুলের ভাষা ও চারুকলার শিক্ষক হচ্ছেন হাসান কামারা সাহেব। তিনি ২০০৬ সালে স্বপ্নে দেখেন, দিগন্তে খুব সুন্দর হস্তলিপি ও উজ্জ্বল বর্ণমালায় লিখা হয়েছে 'অষষধয রং ঃযব মৎবধঃবংঃ' সে সময় তিনি যেহেতু খ্রিস্টান ছিলেন তাই এক খোদাকে মানতেন না। কিন্তু পুরো নিশ্চিতও ছিলেন না যে খোদার নবী ঈসা কীভাবে খোদা হতে পারেন? তিনি বলেন, এই লেখা দেখে ভয়ে তার শরীর কাঁপতে থাকে আর অস্থিরতার কারণে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

২০০৮ সালে প্রায় অনুরূপ আরেকটি স্বপ্ন দেখেন, দিগন্তে আলোর একটি বিরাট গোলক ভেসে উঠে আর চোখের পলকেই তা বিস্ফোরিত হয় এবং ভেতর থেকে এ বাক্যই 'অষষধয রং ঞযব মৎবধঃবংঃ' (আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়) বের হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ২০০৮ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী স্মরণীকা ক্রয় করে পড়তে আরম্ভ করেন আর খোদা তা'লার অনুগ্রহে ধীরে ধীরে আহ্‌মদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এই স্মরণীকা পাঠের মাধ্যমে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান। ২০০৯ সালে পুনরায় স্বপ্নে দেখেন, ওযু করছেন এবং প্রস্তুতির পর নামায পড়ার উদ্দেশ্যে আহ্‌মদীয়া মসজিদে যান। পৌঁছে দেখেন, বাজামাত নামায শেষ হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, বাজামাত নামায না পাওয়ায় খুবই মর্মাহত হই। এরপর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ২০১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ তাকে বাসায় নিমন্ত্রণ করে জিজ্ঞেস করেন, বয়আত করছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, এখনও কতক প্রশ্নের উত্তর অজানা রয়েছে এগুলোর উত্তর পেয়ে গেলেই বয়আত করবো।

এ বছর ২০১১ সালের জানুয়ারীতে তিনি তার সকল প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভূক্ত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এখন পরম আগ্রহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক অধ্যয়ন করছেন।

একজন বেতার সাংবাদিক জনাব জিনটেগামবো আমাদের প্রদর্শনী দেখে বলেন, 'ইসলামের বাণী কি, তা আজ প্রথমবার বুঝলাম। সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে আজ অবগত হলাম, আজই ইসলামকে ধর্ম বলে মানলাম। আমি ইসলামকে খুবই ঘৃণা করতাম কিন্তু আজকে প্রথমবার মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বাণীকে বুঝলাম।'

এরপর আরেকজন অতিথি ফোস্টন আমবুয়াই বলেন, 'শুনেছিলাম মসজিদ 'জাদুর নগরী বা রহস্যময় স্থান'। আজ প্রথমবার মসজিদে প্রবেশ করে অর্থাৎ আহমদীয়া মসজিদে প্রবেশ করে অনুধাবন করলাম, এটি খুবই শান্তিপূর্ণ স্থান।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর অলৌকিক নিদর্শন দেখাচ্ছেন, স্বয়ং সৎস্বভাবের লোকদেরকে বিশ্বের সর্বত্র সত্যপথের দিশা দিচ্ছেন এবং ধরে ধরে জামাতের অন্তর্ভূক্ত করছেন। আর তারা মসীহ্ ও মাহদীকে শনাক্ত করে তাঁর সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। কাজেই বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা এবং গালমন্দ শুনে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে, আহ্‌মদী বিরোধী বা ইসলাম বিরোধীরা যখন আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে এবং তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিক সম্পর্কে অপালাপ করে তখন আমরা চরম মর্মযাতনায় ভুগি আর এর একমাত্র সমাধান হলো, দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং নিজেদের কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষাকে জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

ইউরোপে আহ্‌মদীদেরকে ইসলাম বিরোধী এবং আহ্‌মদী বিরোধী উভয় পক্ষের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। মুসলমান! তারা যে দেশেরই হোক না কেন তাদের পক্ষ থেকেও বিরোধিতা হয়। কেননা, আজকাল মৌলভীরা তাদের মন-মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তুলেছে এছাড়া ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন শক্তি তো এমনিতেই সোচ্চার। আমাদের উন্নতি এবং আমাদের মসজিদ সমূহ এদের উভয়কেই কষ্ট দেয়। আল্লাহ্ চাহেন তো বেলজিয়ামেও যথারীতি প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে।

সেখানেও উভয় পক্ষ হতেই জামাতের বিরোধিতা হচ্ছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা শত্রুর সৃষ্ট সকল ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টে তাদেরই নিপতিত করুন। ভিত্তি রাখার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক। মসজিদের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়ে সেখান থেকে খাদার একত্ববাদ প্রচারিত হোক আর আমরা যেন পূর্বের চেয়ে আরো বেশি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ কাজ করার তৌফিক দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

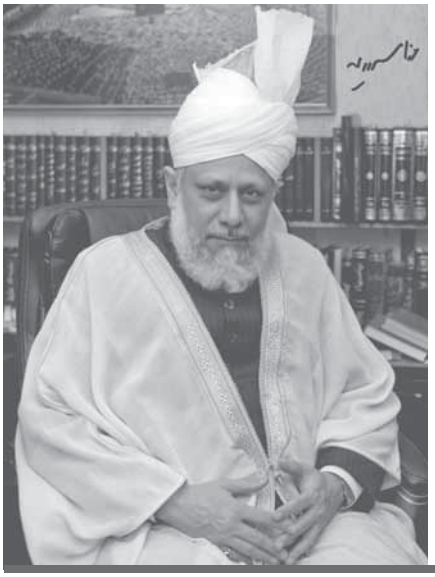

খুতবা ঈদুল আযহা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ১৭ নভেম্বর ২০১০ তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে খুতবা ঈদুল আযহা এরশাদ করেছেন।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين *
إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين

আজ আহমদীয়া জামা'তই রয়েছে যারা একশত বিশ বছর ধরে নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত কুরবান করে যাচ্ছেন।

আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাস প্রাণ উৎসর্গের সেই কুরবানীকে কখনও ভুলতে পারে না, যা সাহেবযাদা হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই দিয়েছিলেন।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۴﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۵﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۷﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

অর্থাৎ এরপর যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌঁছলো সে বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখে থাকি আমি তোমাকে জবাই করছি। অতএব চিন্তা কর (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী? সে বললো, হে আমার পিতা! তোমাকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তুমি তা-ই কর। আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবে।

আজ আমরা ঈদুল আযহা উদযাপন করছি। এ ঈদ কুরবানীর ঈদ। ঐ কুরবানীর স্মরণের ঈদ যা আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে কুরবানীর নতুন মাত্রা যোগ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলার দু'জন বুযুর্গ নবী পেশ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ঐ সময় একটি মস্তক (মাথা) আল্লাহ্‌র পথে কর্তন করতে বাধা দিয়ে বলেছিলেন–"তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ" এবং মস্তক কর্তনের কুরবানী গৃহিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ একটি মস্তক কর্তনের বদলে আল্লাহ্ তাআলা এক মহিমান্বিত জবাহ'-এর নমুনা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। এমন মহান জবেহ'- যার মাত্রা এক মস্তক কর্তনের চেয়েও অনেক বড় মাত্রা ছুঁতে যাচ্ছিল। যখন সেই মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি না কেবল নিজে সারাক্ষণ নিজ প্রাণ কুরবান করতে প্রস্তুত থাকবেন, বরং তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যেও এমন রূহ, এমন প্রাণ সৃষ্টি করবেন যারা সারাক্ষণ কুরবানীর নব নব উদাহরণ সৃষ্টি করতে থাকবে। তারপর আকাশে বসবাসকারীরা দেখেছেন কত চমৎকার কুরবানীর অপূর্ব রং তারা সৃষ্টি করে চলেছেন। কুরবানীর আশ্চর্য আশ্চর্য উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। কুরবানীর ময়দানে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় রত থাকছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরাম কুরবানীর সময় চিন্তা করতেন যে আল্লাহ্ তাআলা এ আমলে সন্তুষ্ট হবেন তো! ধৈর্য এবং সহনশীলতার কুরবানী দিতে তাঁরা তাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর নমুনার উপর চলতে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকতেন।

যখন অর্থ সম্পদ কুরবানীর সময় এসেছে তখন আঁ হযরত (সা.) তরবীয়ত প্রাপ্ত সাহাবা এই কুরবানীতে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চেষ্টা করেছেন। যখন প্রাণ কুরবান করার সময় এসেছে তখন তারা এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন যে মানুষ হতবাক হয়ে যায়। তাদের প্রাণের কুরবানীর উৎসাহকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন (সূরা তওবা : ৯২)

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿۹۲﴾

তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয় থেকে তাদের চোখ দিয়ে (অশ্রু) ঝরে যে তাদের হাতে খরচ করার মত কিছু নাই। এখানে কেবল মাল খরচের কথা নয়। বরং আল্লাহ্‌র পথে জেহাদের কথা বলা হয়েছে। তখন অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, দীর্ঘ পথ সফরের জন্য যে যানবাহনের প্রয়োজন ছিল তা তাদের ছিল না। গরীব ছিলেন তারা। দারিদ্র এতটা ছিল যে সফরের জন্য জুতাও ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাদের চাহিদা ছিল, আমাদের জুতা দেয়া হলে আমরা এই দীর্ঘ সফর পায়ে হেঁটেই যাত্রা করতাম। সফরের জন্য আমরা ঘোড়া বা উট চাচ্ছি না, আমরা জুতা চাচ্ছি যেন আমরা হেঁটেই সফর করতে পারি।

তারা জান প্রাণ কুরবান করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু (প্রাণ দিতে যুদ্ধের ময়দানে যেতে) দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু ঐ যুগে অবস্থা এমন ছিল যে, ঘোড়া বা উট তো দূরের কথা জুতাও ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, এরা নিশ্চয় পাকা মু'মিন ছিলেন যারা কুরবানী করার জন্য উৎসুক ছিলেন। যখন তাদেরকে অস্বীকার করা হলো যে, জামা'তের তরফ থেকে আমরা তোমাদের জন্য জুতাও সরবরাহ করতে পারছি না, কোন যানবাহন যোগাড়ের তো প্রশ্নই উঠে না। নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারলে কর। এ কথায় তাদের চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল যে, হায়! আমাদের জন্য যদি সম্ভব হতো তাহলে আমরা দেখাতে পারতাম যে, আমরা কুরবানী দিতে ভীত নই। জান-মাল সবই তো আল্লাহ্‌র।

আমরা তো কুরবানী দিতে প্রস্তুত! সর্বক্ষণ কুরবানীর জন্য উৎসাহিত, তারপর যখন সুযোগ এসেছিল তখন প্রমাণ করেছিলেন যে তারা ভুল বলেন নি, তারা বাহানা করার মত ছিলেন না। সুতরাং তারা কুরবানীর ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিয়ে ঐ মর্যাদা লাভ করেছিলেন যার সার্টিফিকেট আল্লাহ্ তাআলা **'রাযিআল্লাহো আনহুম'** বলে প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ– আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

অতএব হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) "স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছেন" বলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন যার ফলে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন মহানবী (সা.) **'জাবহে আযীমে'র** এমন মহান উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এমন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, যে তাঁর (সা.)-এর মান্যকারীরাও কুরবানীর এমন মাত্রা সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে **'রাযি আল্লাহু আনহুম'**-এর সম্মানে ভূষিত করেছেন। সুতরাং ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার এই ফসল যা কুরবানীর মাত্রা সৃষ্টি করে ফলতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঐ কুরবানীর বিনিময়ে জাগতিক সাজ-সজ্জাও প্রদান করেছিলেন।

দেশও দিয়েছেন, শাসন ক্ষমতাও দিয়েছেন। আজ আমরা যদি দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব নি:সন্দেহে কতক মুসলমান দেশে জাতিগত সম্পদ তো আছে কিন্তু খোদা তাআলার সন্তুষ্টির সেই পদমর্যাদা দৃষ্টিগোচর হয় না যাতে খোদা তাআলার নৈকট্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। তারপর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও (তারা) অমুসলিম দেশের ইংগিতে চলে।

আল্লাহ্ তাআলা এই ঈদ প্রত্যেক আহমদীর জন্য সর্বদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করুন।

সেই মুসলমান যারা নিজেদের কুরবানীর ফলে পৃথিবীকে খোদা তাআলার ইবাদতকারীতে পরিণত করেছিল, ইউরোপে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা উড্ডীন করেছিল, তারা যখন কুরবানীর মানকে ভুলে গেল তখন কতক দেশও তাদের হাতছাড়া হয়। হৃদয় যখন ইসলাম প্রচারের পরিবর্তে লোভ লালসার আকাঙ্খি তখন রাজাও দুর্বল হয়ে গেল আর সম্মানও চলে গেল।

বর্তমানে মুসলমান দেশগুলোতে সেই পদমর্যাদা এবং সম্মান প্রতিষ্ঠিত নেই, শেষ পর্যন্ত সব কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হল। এখন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানদের মধ্য হতে যখন কোন শক্তির সম্মুখে আসার চেষ্টা করে আর নিজেদের ধারনায় ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাও আবার এমন ভাবে তরবিয়ত বিহীন লোকদের দ্বারা যারা ইসলামের নামকে উজ্জ্বল করার পরিবর্তে নিজেদের সন্ত্রাসি চিন্তা চেতনার কারণে অমুসলিম জগতে ইসলামকেই কলঙ্কিত করছে। এছাড়া নিজেদের নিস্পাপ মুসলমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা, ধ্বংস এবং লুট-পাট করে শেষ করে দিচ্ছে।

তাই মুসলমান আলেম এবং দেশের শাসকদের নিজেদের চিন্তাকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এ হজ্জের অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় মুফতী নিজের বক্তৃতায় সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন, ইনসাফের শূন্যতার কারণে ঔদ্ধত্য জন্ম নেয়। মুসলমান শাসকগণ যদি জন সাধারণের অধিকারের দিকে দৃষ্টি না দেয় তা হলে এ ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হবে। তিনি (মুফতী সাহেব) যথার্থ বলেছেন, মুসলমানদের রক্তক্ষরণ করা হচ্ছে অথচ ইসলামে সন্ত্রাসের কোন সুযোগ নেই। তিনি এটি সঠিক বলেছেন, অন্যান্য জাতিসমূহ মুসলমানদেরকে (নিজেদের মধ্যে) লড়াতে চায়, তিনি এ ঠিক কথাই বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য আবশ্যক। তবে তিনি ও অন্যান্য মুসলমান উলামা এবং নেতাগণ এ বিষয়টিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন যে, এ যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে অস্তিত্বকে খোদা তাআলা পাঠিয়েছেন তাঁর আজ্ঞা পালনে মাথা অবনত করে রাখবে। আজ্ঞাবহ হয়ে মুসলমান নিজেদের সম্মান পুন:প্রতিষ্ঠা করুক, মসীহ্ এবং মাহ্‌দীর হাতে সমবেত হয়ে এক উম্মতের দৃশ্য উপস্থাপন করুক।

আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক হয়ে কুরবানীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করুক।মুহাম্মদী মসীহ্‌র সাথে সংযুক্ত হয়ে নিজের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধি করুক যা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ হবে। সুতরাং আজ যদি হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর সেই ধারাবাহিকতাকে জারী রাখতে হয় যা সেই **'যিবহে আযীম'** (মহাকুরবানী)-এর মর্যাদায় পৌঁছে ছিল যা প্রত্যেক ধরণের কুরবানীর পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তাই সেই মহান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যায়নে আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও আবশ্যক। মুসলমানগণ যদি একতাবদ্ধ হয়ে যুগের ইমামের বিরোধিতার পরিবর্তে এক হাতে একত্রিত হয়ে (তাঁর হাতকে) দৃঢ়কারী হয়ে যায় তাহলে তারা জগতে সেই দৃশ্য প্রদর্শনকারী হয়ে যাবেন যার ফলে জগত পুণরায় মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য

দেখবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজ কোন মুফতি আর আলেমের ওয়াজ মুসলমানদের একত্রিত করতে সহায়ক হবে না, কোন বাদশাহ-এর তেলের সম্পদ মুসলমানদের এক হাতে একত্রিত করতে পারবে না, আর না সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে প্রথম যুগের কুরবানীর পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। তবে কিছু মানুষ এমন আছে যারা কয়েক দিন ওয়াজের প্রশংসা করে এবং এর উপর আমল করার আবশ্যকতায় গুরুত্ব দিবে। সম্পদের মাধ্যমে বাদশাহ এবং শাসকগণ নিজেদের স্বার্থ অবশ্যই অর্জন করতে পারে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহ দরিদ্র, ক্ষুধা এবং নিঃস্ব পরিবারের সন্তানদের ভুল পদ্ধতিতে ধর্মের নামে ব্যবহার করে তাদের মগজ ধোলাই করে কুরবানীর নামে আত্মঘাতি হামলায় অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যখন মগজ ধোলাইকৃত সেই সন্তানদের ঐ অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসা হয় তখন তারা আত্মরক্ষার চেষ্টায় লেগে যায় যার সুস্পষ্ট করে যে এই আত্মঘাতি হামলা তাদের হৃদয়ের আওয়াজ নয়। আর এমন কয়েকজন ছেলে দৃশ্যপটে এসেছে যাদের পুলিশ গ্রেফতারের প্রেক্ষিতে তারা এমনই বিবৃতি দিয়েছে। তাই এ সন্তানদের মাঝে যখন চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয় তখন তাদের চিন্তার ধরনই পাল্টে যায়।

এখন যাচাই করে দেখুন! অধিকাংশ আত্মঘাতি আক্রমণকারী সন্তান হচ্ছে সে সব সন্তান, যাদের নিজেদের কোন চিন্তা শক্তি নেই। পাকা চিন্তা-চেতনার অধিকারীকে সাধারণত কখনো আপনি আক্রমণে সম্পৃক্ত দেখবেন না। চিন্তা-চেতনার সাথে কুরবানী তো ঐ দুই সন্তান- **মায এবং মোয়া'বেয**-এর ছিল যারা চিতার ন্যায় শত্রুর মাঝে ঢুকে আবু জাহেলকে নির্মম পরিণামে পৌঁছিয়েছিল। তবে সেই জীবন উৎসর্গকারীগণ নিজের ধর্মকে রক্ষা আর শত্রুদের আক্রমণের প্রতি উত্তরের জন্য যুদ্ধের ময়দানে যেতেন।

নতুবা ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির সাথে কষ্ট সহ্যের যুগ কোন স্বল্প মেয়াদী সময়ের ছিল না। অতএব আজ কোন্ ইসলামী যুদ্ধ চলছে? যা প্রতিহত করার জন্য এরা আক্রমণ করছে। আবার আক্রমণও নিজেরই মুসলমান দেশে বসবাসকারীদের উপর দেশীয় আইন পদদলিত করে। সুতরাং তথাকথিত এ কুরবানী সমূহ খোদার দরবারে গৃহীত কুরবানী নয়। সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় মুফতী ঠিকই বলেছেন, আমাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক।

হায়! (যদি) তিনি এটিও বলে দিতেন, এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত কারো খোঁজ কর, পৃথিবী এবং আকাশের নিদর্শন সমূহ অবলোকন করে এ ঘোষণাও করে দিতেন যে, যদিও নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান আছে আর প্রকাশিতও হচ্ছে তবে দাবী কারকের ব্যাপারে আমাদের কিছু সতর্কতা (অবলম্বন করতে হবে) আছে। আসুন এ হজ্জের সময় বিশেষ করে যারা হজ্জকারী আর সাধারণত মুসলমান উম্মত, এ দোয়া করি হে খোদা! যদি এ দাবীকারক সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সত্য থেকে বঞ্চিত করো না।

আমাদেরকে পথ দেখাও যেন আমরা তোমার সেই বাণীকে যা তুমি আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে দিয়েছ তাঁকে গ্রহণ করে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি। যদি আন্তরিকতার সাথে এবং নেক নিয়তে এই দোয়া করেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা পথ দেখাবেন, ইনশাআল্লাহ। আর এই মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর বয়আত গ্রহণ করে তারা জিহাদের প্রকৃত মর্মও জানতে পারবে। কুরবানীর বিভিন্ন মান সম্পর্কেও ধারণা সৃষ্টি হবে।

আর এই যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর **'আহমদ'** বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত হবে। কেননা এ যুগে মুহাম্মদ (সা.)-এর **'আহমদ'** বৈশিষ্টই দুনিয়াতে এক বিপ্লব আনয়ন করবে। যে বিপ্লব পুরো বিশ্বকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুগত করে দিবে। নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে ইসলামের পতাকাতলে একত্র করবে। অতএব আজ এটি আল্লাহ্ তাআলার অটল তকদীর, আজ এই কাজ যুগ ইমাম, মুহাম্মদী মসীহ এবং তার দাসেরাই সম্পন্ন করবে। ধৈর্য, দোয়া ও কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝে, কুরবানীর উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করে এ কাজ সম্পন্ন করবে।

আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এই ধৈর্য, দোয়া এবং কুরবানীর উন্নত মান আমাদেরকে দেখায়। কুরবানীর মান কখনও আত্মঘাতী হামলা করে নিজেকে উড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথবা বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে আত্মঘাতী হামলাকে প্রাণউৎসর্গের নাম দিয়ে অর্জিত হয় না। বরং কুরবানীর মান তো সেই ধৈর্য, তুষ্টি ও আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয় যা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত তার অনুসারীদের সামনে পেশ করেন।

তিনি যে বাণী সামনে উপস্থাপন করেন তার আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যখন আঁ হযরত (সা.) উম্মতকে মুহাম্মদী মসীহর যুগের জন্য **ইয়াযাউল হারব**-এর শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন তখন এর পূর্ণ আনুগত্য করাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়।

সুতরাং আজ আহমদীয়া জামাতই রয়েছে যারা একশত বিশ বছর ধরে নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত কুরবান করে যাচ্ছেন। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস প্রাণ উৎসর্গের সেই কুরবানীকে কখনও ভুলতে পারে না, যা সাহেবযাদা হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন ধরণের লোভ লালসা ও বেশ কিছুদিন চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি চরম ধৈর্য ও তুষ্টির সাথে অত্যাচারিদের পাথর বষর্ণের সময় নিজের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করতঃ প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কামেল বিশ্বাসের আদর্শ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাণ বিসর্জনের চেয়ে বড় আর কোন জিনিস নেই। আর এমন দৃঢ়তার সাথে প্রাণ বিসর্জন দেয়া স্পষ্ট ঘোষণা করছে, তিনি আমাকে আকাশ হতে অবতরণ করতে দেখেছেন।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, মরহুম শহীদ প্রাণ দিয়ে আমার জামাতকে একটি নমুনা বা আদর্শ দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে আমার জামাত একটি বড় নমুনা বা আদর্শের মুখাপেক্ষী ছিল। অতএব যুগ ইমাম যার কুরবানীকে একটি আদর্শ আখ্যা দিয়ে দিয়েছেন তা আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস থেকে কখনও মুছে যেতে পারে না। হ্যাঁ, এই আদর্শকে সামনে রেখে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের পরবর্তী আগমনকারী সদস্যগণ, তারা কুরবানীর মান সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় জীবনকে উৎসর্গ করে আর আজ পর্যন্ত তা করে আসছে।

এ বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে মান্য করে তার মান্যকারীদের

মধ্য থেকে ৯৮ জন নিজেদের জীবনের নজরানা পেশ করেছেন। এবং উক্ত নযরানা উপস্থাপন করে জগতকে বলে গেছেন, আমরা কুরবানীর এমন মান প্রতিষ্ঠাকারী যার মূল সেই আত্মা থেকে উৎসারিত হচ্ছে যে রূহ হযরত রাসূলে পাক (সা.) নিজ সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং যার মূল এতটা গভীরে বরং হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে মূলকে শত্রুর বিরোধিতার ঝড় কিভাবে হেলাতে পারে? মসীহ্ মাহদী যে চারাগাছ লাগিয়েছিলেন আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় তা আজ এক বড় বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। যার ডালপালা জগতের মহাদেশসমূহের ১৯৮টি দেশে বিস্তৃত হয়ে গেছে। এ বৃক্ষকে বিরোধিতার ঝড় কিভাবে দোলাতে পারে। আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসে এটিই দেখেছি যে, প্রত্যেক কুরবানী, প্রত্যেক বিরোধিতা নতুন ফলাফল বয়ে আনে এবং অতীতের তুলনায় অত্যধিক ফল বয়ে আনে।

আজ পর্যন্ত জামাতের কুরবানীসমূহ, কুরবানীর ইতিহাসে এ বছরের পূর্বে ৭৪ সালে সবচেয়ে বেশি শাহাদত বরণ করেছিল যার সংখ্যা প্রায় ৩০ জন। কিন্তু ৭৪ সালের পর জামা'ত যতটা বৃদ্ধি লাভ করেছে ইতিপূর্বে এর কোন উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর্থিকভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন, তাদের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলার কল্যাণরাজী দেখে স্বয়ং কুরবানীকারীরা অবাক হয়েছে যে খোদা তাআলা কিভাকে নিজে কুদরতের নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।

এরপর ৮৪ সালের জঘন্য অর্ডিনেন্স যাতে ৭৪ সালের জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্তের ওপর ভর করে আরও বাড়তি কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। আহমদীদের জীবন যাপন অতিষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে। কারাগারগুলো আহমদীদের মাধ্যমে ভরে ফেলা হয়েছিল যে আহমদীরা কাউকে সালাম পর্যন্ত দিতে পারত না বরং মুসলিম নামও রাখতে পারত না।

যুগ খলীফাকে পাকিস্তান থেকে চলে যেতে হয়েছে তখন আল্লাহ্ তাআলা জামাতের প্রসারে সেই রাস্তা খুলে দিয়েছেন যা পূর্বে চিন্তাই করা যেত না। আর এ বিধানের ফলে দুনিয়ার সামনে আহমদীয়াত পরিচিতি লাভ করেছে। আজও উক্ত বিধান পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। আহমদীরা উক্ত সমস্যার মোকাবিলা করছে। বিভিন্ন সময়ে যখনই সরকারের মাথায় এই চিন্তা আসে তারা আহমদীদের উপর উক্ত বিধানের কারণে কাঠিণ্যের সৃষ্টি করে।

যাহোক এ সংবিধানের কারণে যে সকল আহমদী আজ পাকিস্তানে বসবাস করছেন তারা পুণরায় ধারাবাহিকভাবে কুরবানীর মান সমুন্নত রেখে চলেছেন যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, সরকারী ব্যবস্থাপকগণ যেভাবে পারছে বরং মৌলবীদের মাধ্যমেও আহমদীদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করা হয়।

ইত্যবসরে জামাত যে আত্মত্যাগ করেছে তা কোন সাধারণ ত্যাগ নয়। আর আল্ল?াহ্ তাআলার অনুগ্রহের ধরণও এমন যা অপরিমেয়। শত্রুরা বলে, নিবৃত্ত হও এবং আহমদীয়াত থেকে তওবা কর অন্যথায় অমুকটা করব, তমুকটা করব। যেভাবে আমি বলেছি, আহমদীরা তাদের অত্যাচারের শিকার হয়ে আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভা করেছেন। কিন্তু কোন একজনের স্বজনও দুর্বলতা দেখিয়ে শত্রুর সম্মুখে নতি স্বীকার করে নি, প্রাণ ভিক্ষা চায় নি এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে ক্ষমা ভিক্ষা চায় নি। তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সম্প্রতি মার্দানে জনাব শেখ মাহমুদ সাহেবকে শহীদ করা হয়েছে এবং তার স্নেহাস্পদ ছেলে আরিফ মাহমুদ আহত হয়েছে। যেভাবে আমি জুমুআর খুতবাতেও বলেছি, নাযের উমরে আমা যখন আহত এ যুবকের সাথে ফোনে কথা বলেছেন তখন সে তাকে বলেছেন, আহত হওয়া সত্ত্বেও আমি মনোবল হারাই নি এবং কেউ আমাকে আমার ঈমান থেকেও টলাতে পারবে না; ইন্‌শাআল্লাহ্।

অতএব যে জাতির মাঝে এমন আত্মোৎসর্গকারী রয়েছে, এমন যুবক রয়েছে যারা মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কথা বলে তাদেরকে মৃত্যুর ভয়ে ভীত করা কিভাবে সম্ভব? এ দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই তাদের মাঝে এ ঈমান সৃষ্টি হয়েছে যে, **নিশ্চিতরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী।** আর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এখন এতেই নিহিত যে, এই মসীহ্ ও মাহদীর সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই যেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং তাঁর কৃপার অংশীদারিত্ব লাভ হয়।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী- **নাহনু আওলিয়ায়ুকুম ফিল হায়াতিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ**- তাদের হৃদয়কে দৃঢ় করে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করে। অতএব ইহ জগত ও পর জগতে আল্ল?াহ্ তাআলা যার বন্ধু ও অভিভাবক তখন বিশ্ববাসীকে তার কিসের ভয় এবং কে তাকে আত্মত্যাগে বিরত রাখতে পারে? কাজেই এ যুবক যখন এ কথা বলেছে যে, একটি দুটি গুলি তো কোন বিষয়ই না। বরং আমাকে ঝাঁঝরা করে ফেললেও আমি পরওয়া করি না।

অতএব, এমন লোকদের মাঝেই এ ধরনের দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় যারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। কাজেই, আমরা যখন যুগ ইমামের সাথে অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি তখন তা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশাতেই হয়েছি। এ বাসনাতেই অঙ্গিকার করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে হবে।

এ কথা জেনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, প্রেম ও বিশ্বস্ততার জমীন রক্ত সিঞ্চন ব্যতীত সজীব হয় না। এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই অঙ্গিকার করেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- কে বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেননা আমরা অনেক প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ হতে দেখেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গিকার কোন একটি নির্দিষ্ট যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

বা এমন ছিল না যে কিছু প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে আর কিছু হবে না। তিনি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ হবার জন্যই ছিল। আল্লাহ্ তাআলা কখনো তার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। তবে তা থেকে অংশ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশিত পথে চলা আবশ্যক। নিজের মধ্যে আনুগত্য ও কুরবানীর মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটি করতে থাকব, আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা বিষয়টির আরো গভীরে গিয়ে দেখলে দেখতে পাই, আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগে ইসলামের পুণর্জাগরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্ল?হ্ তাআলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আহমদীয়াতের মাধ্যমে ইসলামের উন্নতি হবে। **'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম'**- আয়াতে আল্ল? হ্ তাআলা এটি স্পষ্ট করেছেন।

বরং আমরা আরো চিন্তা করলে ও গভীর দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার বিষয়ে **'কাদ সাদ্দাকতার্ রুইয়া'** আয়াতের মাধ্যমেই নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ রুইয়া (সত্যসপ্ন) পূর্ণ করতে শুধু পিতার ভূমিকাই ছিল না, বরং পুত্র তখন বলেছে **'সাতাজেদুনী ইনশাআল্লাহু মিনাস্ সাবেরীন'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যা চেয়েছেন, তাতে নিশ্চয় তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবে।

অতএব, এ ধৈর্যের অঙ্গীকার পরবর্তী বংশধরদের কুরবানীর মান অর্জনের রায়ও দিয়ে দিয়েছে। শুধু প্রাণ বিসর্জন দিলে তাতে কি ধৈর্য প্রকাশ পেত? ধৈর্যের অমূল্য মনিমানিক্য তো তখন উন্মুক্ত হবার ছিল যখন ধারাবাহিক কুরবানীর মান প্রতিষ্ঠিত হবার ছিল। যখন আল্লাহ্ তাআলার খাতিরে কোন অভিযোগ ছাড়াই সর্বপ্রকার কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবে। আর সেটি সমগ্র জীবন এক জলহীন ও তরুলতাহীন স্থানে শৈশব থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর আল্লাহ্ তাআলা যখন বলেছেন, **'ইন্না কাযালিকা নাজযিল মুহসিনীন'** অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীলদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। দুজনকেই কুরবানী করতে প্রস্তুত দেখে তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সৎকর্মশীলদের ধারা **'জিবহে আযীম'** (বড় কুরবানী) এর যুগের মাধ্যমে আরম্ভ হবার ছিল।

যখন আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সৎকর্মশীল সৃষ্টি করলেন, লক্ষ লক্ষ পূণ্যবান সৃষ্টি করলেন, যারা ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এরপর যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি, পরবর্তীদের যুগ আল্লাহ্ তাআলা এ যুগের সাথে জুড়ে দিয়েছেন যাতে ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **'ওয়া ইবরাহীমুল্লাযী ওয়াফ্ফা'** অর্থাৎ ইব্রাহীম যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন তিনি পুত্রকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হলেন তখন এ আওয়ায আসল। অতএব, যখন পিতার বিশ্বস্ততা এবং পুত্রের ধৈর্য একত্রে প্রকাশ পেল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের

আল্লাহ্ করুন এই ঈদ যেন আমাদের প্রিয়গণের কুরবানীসমূহকে সর্বদা স্মরণ করাতে থাকেন। আর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যেন শান্তিতে না বসি যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পতাকা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেম-প্রীতি, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারী পৃথিবীতে অধিক সংখ্যায় না দেখি। আর যখন এরূপ হবে তখনই কেবল আমাদের কুরবানী সমূহের কবুলিয়াতের প্রকৃত ঈদ হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই শক্তি সামর্থ্য দান করুন।

স্মরণকে জারি রাখার জন্য শুধু হজ্জের ইবাদতই মুসলমানদের মধ্যে চালু করলেন না, বরং এরপর সেই মহান নবীকে এ বংশের মধ্যে আবির্ভূত করলেন যিনি **ফানাফিল্লাহ্** (খোদার মধ্যে বিলীন) হবার একক ও মহান মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করলেন। যার উল্লেখ কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে করেছেন–

'তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন আমার মৃত্যু সবই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।' আবার আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এই রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের পথে চল।

কেননা আজ এই আদর্শই তোমাদের মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করে, তোমাদের ইবাদতের মানদন্ডকে প্রতিষ্ঠিত করে। বরং সমগ্র সৃষ্টি, সব পুণ্য কর্মের মানদন্ড মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং যে বিশ্বস্ততা, ধৈর্য ও কুরবানীর মানদন্ড হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর মাঝে এসে সেটার চূড়ান্ত মার্গের পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সামনে প্রাথমিক মানদন্ড থেকে নিয়ে চূড়ান্ত মানদন্ড পর্যন্ত তুলে ধরে এ নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের জন্য জীবনাদর্শ হলো এই চূড়ান্ত মানদন্ড। এই চূড়ান্ত মানদন্ড অর্জনের জন্য রাসূল (সা.)-এর সাহাবাদের মাঝে হাজারো ইসমাঈলের জন্ম হয়েছে। যারা খোদা তাআলার নামকে সমুন্নত করার জন্য, ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে জগতে সম্প্রসারণের জন্য নিজেদের শিরোচ্ছেদ করেছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আর যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি, আল্লাহ্ তাআলা তাদের ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার কারণে **"রাযিয়াল্লাহু আনহুম"** (আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট) এর সম্মান দান করেছেন। আজ মসীহ্ ও মাহ্দীর সেবকদেরও এটাই কাজ, তারা যেন ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার মূর্তিমান প্রতীক হয়ে যায়। এই বছর যে মসীহ্ ও মাহ্দীর একশত সেবক ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার বহির্প্রকাশ হিসেবে কুরবানী দিয়েছে এটা নিশ্চিত এই বিষয়ের প্রমাণ, আমরা প্রেমপ্রীতি ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কখনও পিছনে থাকার পাত্র নই। সুতরাং এই কুরবানীকারীরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে নিয়েছে কেননা এটা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি। আমার কাছে যে চিঠিগুলো আসে এটার বহির্প্রকাশ হিসেবে আসে–আমরাও কুরবানী দেয়ার

জন্য প্রস্তুত আছি, আমরাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে–

তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা এখনও প্রতিক্ষায় আছে, কখন সুযোগ আসবে আর তারা নিজেদের নিষ্ঠাপূর্ণ অঙ্গীকার সত্য সাব্যস্ত করে দেখাবে'। সুতরাং এই ঈদ ঐ কুরবানীকারীদের কুরবানীকে স্মরণ রেখে **ওয়া মিনহুম মাই ইয়ানতাজির** এর অঙ্গীকার করার ঈদ। এটা খোদা তাআলা ভাল জানেন, কার নিকট থেকে কেমন কুরবানী নিবেন।

কিন্তু আমরা যদি বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার পূর্ণ করে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে রাখি, আর আমাদের কুরবানীকারী প্রিয়জনদের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে যেতে থাকি তাহলে নিশ্চিত আমরা আল্লাহ্ তাআলার আশীষসমূহের উত্তরাধিকারী হবো। এই শান্তনাও আমাদেরকে খোদা তাআলাই দিয়েছেন, আন্তরিকতার সাথে যারা পুণ্য করে খোদা তাআলা তাদেরকে পুরস্কার দেন।

আমাদের মধ্যে থেকে যারা কুরবানী করেছে তাদের কুরবানীকে আল্লাহ্ তাআলা এভাবে কবুল করেছেন, আফ্রিকার দুরদুরান্ত জঙ্গল এবং মরুভুমি থেকে নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার আলোকিত শহরগুলোতে শুধু যে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে তা-ই নয় বরং বয়আতের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আফ্রিকা দেশের একটি রিপোর্ট আমি দেখছিলাম, যেখানে গত বছর এক হাজার বয়আত হয়েছিল সেখানে শাহাদতের ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রায় পাঁচ হাজার বয়আত হয়েছে।

এভাবেই আমাদের একজন মুরব্বী মোবাল্লেগ সাহেব রিপোর্ট দিয়েছেন, এক জায়গায় গিয়েছিলাম সেখানে অনাবৃষ্টির/প্রচন্ড খরার কারনে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছিল এবং ফসলও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সেখানকার লোকজন ইস্‌তেসকার নামাযের জন্য বাহিরে বের হল। তখন আমি তাদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে পড়াবেন? এ হলো প্রকৃত পদ্ধতি/নিয়ম। তখন সে বলল, তাহলে আপনিই পড়ান। তিনি নামায পড়ালেন আর বললেন, সেই সময় আমার অবস্থা এমন হয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় (এইতো কিছুদিনের কথা যখন লাহোরে দুর্ঘটনা ঘটেছিল) ৮৫/৮৬জন আহমদীগণ কুরবাণী দিয়েছেন।

আজকে তো এই নিদর্শন দেখাও, তাদের কুরবাণীকে গ্রহণ করে আমাদেরকে এখানে একটি বড় জামাত দান কর। অত:পর আল্লাহ্ তাআলা আশ্চর্যান্বিতভাবে এ নিদর্শন দেখালেন, প্রখর রোদ থেকে কিছুক্ষণ পরেই আকাশে মেঘ এল এবং বৃষ্টি হলো আর এ গ্রামে অর্থাৎ এ অঞ্চলে এ বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লো, আহ্‌মদীদের দোয়ার বদৌলতে আমাদের ফসলে সজীবতা এসেছে। সেখানে এক হাজারেরও বেশি সংখ্যায় বয়আত হয়েছে। এ হলো নিদর্শন যা খোদা তাআলা দেখিয়েছেন।

এভাবে আরব দেশ থেকেও কিছু চিঠি আসছে, তাদের এদিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঘানাতে যে দুজন মুসলমান নেতা আছে তারা বয়আত করেছে যারা আগে বিরোধীতা করতো। এগুলো আল্লাহ্ তাআলা করছেন। তাদের হৃদয়কে ফিরাচ্ছেন। এটি এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে, আল্লাহ্ তাআলা এ সকল কুরবানীকে গ্রহণ করেছেন যার বাহ্যিক নিদর্শনও প্রকাশ পাচ্ছে। আহ্‌মদীয়াত কোন আঞ্চলিক ধর্ম নয় বরং এটাতো ইসলামের প্রকৃত ছবি এবং ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম যাকে আল্লাহ্ তাআলা জগতে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুতরাং পাকিস্তান অথবা কিছু মুসলমান দেশগুলোর বিরোধীতা কি এ আন্তর্জাতিক বাণীকে বাধা দিতে পারে? এটি বিরোধীদের ভ্রান্ত ধারনা। বরং মুসলমান দেশগুলোতেও আহ্‌মদীয়াতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এটি এজন্য, এখানে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আ.) এর স্বত্ত্বার প্রশ্ন নয় বরং আঁ-হযরত (সা.) এর সাথে খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি যা জগতের কোন শক্তি এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। আজ এ পুরো বিশ্বে শুধু একটি জামাতই রয়েছে যা মসীহ্ মাহ্‌দীর দাসদের জামাত। যারা খোদার প্রতিশ্রুতি এবং তকদীরের অংশ হয়ে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে। এ হলো ঘটনা/বিষয়। বিষয়টি তো পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তাই এখন এ বিষয়টি আমি ছেড়ে দিচ্ছি।

যাই হোক এটা কেবলমাত্র আহমদীয়া জামাতই যারা আঁ হযরত (সা.) এর এই সংবাদ পৌঁছাচ্ছে। এর জন্য আহমদীদের যে ত্যাগ সমূহ, তা নতুন নতুন পথ দেখাচ্ছে এবং উম্মোচন করছে। সুতরাং এই স্পৃহা যা আঁ হযরত (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হচ্ছে এই মহান কুরবানী যা তিনি আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এটা আজ মুহাম্মদী মসীহ্ ও তাঁর দাসদের প্রত্যেক জাতির আহমদী মুসলমানদের মাঝে একটি নিদর্শনরূপে প্রকাশ হতে দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তানের আহমদী হোক বা হিন্দুস্তানের আহ্‌মদী অথবা বাংলাদেশের আহমদী বা ইন্দোনেশীয়ার আহমদী অথবা কোন আফ্রিকান দেশের বা আরব দেশের আহমদী নিজেদের কুরবানীর উন্নত মানদন্ডের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আরম্ভ করেছেন। যেন ইসলাম ও আহমদীয়াতের পতাকা দ্রুত পৃথিবীতে উড়তে দেখে।

আল্লাহ্ করুন এই ঈদ যেন আমাদের প্রিয়গনের কুরবানীসমূহকে সর্বদা স্মরণ করাতে থাকেন। আর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যেন শান্তিতে না বসি যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পতাকা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেম-প্রীতি, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতকারী পৃথিবীতে অধিক সংখ্যায় না দেখি। আর যখন এরূপ হবে তখনই কেবল আমাদের কুরবানী সমূহের কবুলিয়াতের প্রকৃত ঈদ হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই শক্তি সামর্থ্য দান করুন।

খুতবা সানীয়ার পরে হুযূর আনোয়ার বলেন, এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ায় শহীদগনের পরিবার পরিজনগণকে স্মরণ রাখবেন। মোবাল্লেগ সিলসিলাগণকেও স্মরণ রাখবেন। ঐসকল কুরবানীকারীগণকেও স্মরণ রাখুন যারা যেভাবেই জামাতের জন্য কুরবানী করছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য এ ঈদকে সর্বদিক থেকে কল্যানমন্ডিত করুন। আমাদের দূর্বল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে আমাদেরকে দ্রুত বিজয় ও সাহায্যের দৃশ্য দেখান। সেই সাথে আমি আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। অত:পর সমস্ত পৃথিবীর আহমদীদেরকেও **ঈদ মোবারক**।

আল্লাহ্ তাআলা এই ঈদ প্রত্যেক আহমদীর জন্য সর্বদিক থেকে কল্যানমন্ডিত করুন। দোয়ায় শামিল হোন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত)

‘আল ওয়াছে’ এবং প্রসারমান বিশ্ব

[মূল : মোহাম্মদ জিয়া এইচ শাহ্ ও মোহাম্মদ লুৎফর রহমান]

অনুবাদ : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

“তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী এবং যথাযথ আকৃতিদাতা। সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা-ই আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়” (৫৯ : ২৫)।

“আর আমরা এক বিশেষ ক্ষমতাবলে আকাশ বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি” (৫১ : ৪৮)।

“যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ শস্যদানা থাকে। আল্লাহ্ যার জন্য চান (এর চেয়েও) বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ” (২ : ২৬২)।

আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট এ বিশ্বের উপর চিন্তা করার জন্যে পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে আমন্ত্রণ জানায়। সৃষ্টিতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যাকে সব মানুষের জন্যে নিদর্শনের উদাহরণ হিসেবে প্রকৃতির নিয়মের উপর গভীরভাবে চিন্তা করার জন্যে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, মহান কুরআন বলে, “তারা কি তাহলে উটের দিকে তাকিয়ে দেখেনা, এটাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, এটাকে কিভাবে উচ্চে উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পর্বতগুলোর দিকে, কিভাবে তাদের ভিত্তি দান করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে, কিভাবে এটাকে বিস্তৃত করা হয়েছে? (৮৮ : ১৮-২১) সূরা ‘রহমান’-এ আল্লাহ্ বলেন, “পরম করুনাময় খোদা, তিনি কুরআন শিখিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বাগ্মিতা শেখালেন। চন্দ্র ও সূর্য একটি হিসাব অনুযায়ী নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে। গুঁড়িবিহীন লতাগুল্ম ও গাছপালা, উভয়ে তাঁর আদেশে সিজ্‌দাবনত রয়েছে। আর আকাশকে তিনি উঁচু করেছেন এবং ন্যায় বিচারের মানদন্ড বানিয়েছেন” (৫৫ : ২-৮)।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেটা এক মাঝারি সূর্যের ৯টি গ্রহ ও ওগুলোর বাইরে যা কিছু রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম। সবগুলো গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং একই সময়ে অবিরতভাবে তাদের নিজ অক্ষরেখার উপর পাক খায়। আমাদের সূর্য, যার চতুর্দিকে এই ৯টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, উহা সেই ছায়া- পথের অঙ্গিভূত, যা অন্যান্য ১০০ বিলিয়ন সূর্য দ্বারা সৃষ্ট; এসব সূর্যের মধ্যে যেটা সবচে’ নিকটবর্তী, সেটা ৪ আলোক বর্ষের চেয়েও দূরে অবস্থিত এবং সবচে দূরে যেটি, সেটার দূরত্ব ১ লক্ষ অথবা ততোধিক আলোক-বর্ষের চাইতেও বেশী।

আলোক-বর্ষ হচ্ছে আলোর প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতির এক বছরের পথের দূরত্বের সমান। এই নয়টি গ্রহ ও আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অঙ্গিভূত, সেটার ব্যাস প্রায় ১ লক্ষ আলোক-বর্ষের সমান এবং মহাশূন্যের কোন এক দূর-বিন্দু থেকে পর্যবেক্ষণ করে এটাকে অনেকটা পেঁচাল-নীহারিকার মত মনে হয়েছে যা দেখতে অনেকটা পেঁচাল নীহারীকার ছবির মত এবং যে-কোন গ্রহমন্ডলীর নকশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এডউইন পাভেল হাব্‌ল (১৮৮৯-১৯৫৩) ১৯২২-২৪ সনে আবিষ্কার করেন যে, আকাশের সবগুলো নীহারিকাই আমাদের ছায়াপথের অংশ নয়। তিনি দেখতে পান যে, কতিপয় নীহারিকার এমন তারকাসমূহ ধারণ করে, যাদেরকে বিষম Cepheid বলে। উহাদের আপেক্ষিক দূরত্ব, আপাতবিস্তার এবং পরম-বিস্তার বিবেচনা করে হাব্‌ল স্থির করেন যে, এসব Cepheid কয়েক লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে এবং এভাবে ছায়াপথের বাইরে এবং যে নীহারিকায় সেগুলো অবস্থিত, সেসব নীহারিকা আসলে ভিন্ন ছায়াপথের নীহারিকা। ১৯২৪ সনে প্রচারিত এই আবিষ্কার জ্যোতির্বিদদেরকে পৃথিবী বা নিখিলবিশ্ব সম্পর্কিত তাদের ধারনাকে বদলাতে বাধ্য করে।

বহি:স্থ এসব ছায়াপথের অস্তিত্ব আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই আকৃতি ভেদে হাব্‌ল তাদের শ্রেণীভাগ এবং নক্ষত্র ধারণক্ষমতা এবং ঔজ্জ্বল্যনমুনা অনুসন্ধান করার কাজে হাত দেন (১৯২৬)।

ছায়াপথের গবেষণায় হাব্‌ল তার দ্বিতীয় যে অসাধারণ আবিষ্কারটি করে ফেলেন, তা হচ্ছে–এসব ছায়াপথ (Galaxi) দৃশ্যত: ছায়াপথ (Milky-way) থেকে হটে আসছে এবং যতই দূর সরে যাচ্ছে, তাদের হটে-যাওয়ার বেগ ততই দ্রুততর হচ্ছে (১৯২৭)।

এই আবিষ্কারের ভাবার্থসমূহ ছিল অপরিমেয়। দীর্ঘকাল যাবত স্থির এ বিশ্ব বিস্তৃত হচ্ছিল; এবং এমনকি তা আরো অদ্ভুতভাবে, যখন হাবল আবিষ্কার করলেন (১৯২৯) যে বিশ্ব জগৎ এমনভাবে বিস্তৃত হচ্ছে যে, ছায়াপথের গতি বৃদ্ধির হার-এর মান ধ্রুবক, যে অবস্থাকে বর্তমানে ‘হাবল্‌স কন্সট্যান্ট’ নামকরণ করা হয়েছে।

আমাদের ছায়াপথের নিকটতম ছায়াপথটি প্রায় ১৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে অবস্থান করছে। আর যেটি সবচে’ বেশী দূরত্বে, সেটি সম্ভবত দশ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে অবস্থিত। আধুনিক

জ্যোতির্বিদ্যা এক বিলিয়ন অথবা ততোধিক ছায়াপথের অবস্থান নির্দেশ করতে পারে, যার প্রত্যেকটিই কয়েক বিলিয়ন জ্বলন্তসূর্য ধারণ করে। স্যার জেমস্ জীনস্ লিখেন, বিশ্ব-জগতে অবস্থিত তারকার সংখ্যা আসলে বিশ্বের সমুদ্রতটসমূহে অবস্থিত বালুকণাসমূহের সংখ্যার সমান। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞজনদের আধুনিককালের ধারণা হচ্ছে যে, সম্ভবত: বিশ্বের সবক'টি সমুদ্র সৈকতের বালুকনার সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক তারকা রয়েছে। যখন আমরা এসব তথ্য, সম্মিলিতভাবে বিবেচনায় আনি, তখন দেখতে পাই যে, প্রত্যেক তারকা পৃথিবীর চেয়ে গড়ে আনুমানিক এক বিলিয়ন গুণ বড়। তখন বিশ্ব নিখিলের বিস্তৃতি আমাদেরকে কেবলই হতবুদ্ধ করে।

খুবই বাস্তবধর্মী ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এসব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। নিকট অতীতে তারা এক অভিনব ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন এবং ২০০৬ সনে তারা তা বাস্তবায়ন করেন। বিভিন্ন দূরবীনকে সংযুক্ত করে তারা অনেক বেশী কর্মদক্ষতাসম্পন্ন এক দূরবীন তৈরী করেছেন, যার রয়েছে ৫০০০ মাইল কর্মদক্ষতাসম্পন্ন ব্যাস।

একাজে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ ভিত্তি-ভূমি এবং অনেকগুলো দূরবীণ ব্যবহার করেন। এসব দূরবীণের সাহায্যে তারা নিকটতম পেঁচাল-বাহু (যার জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত নাম হচ্ছে–'ডব্লিউ ও এইচ) এর দূরত্ব পরিমাপ করেন, যা প্রায় ৩৬ হাজার বিলিয়ন বা ৩৬×১০^{১৫} মাইল বলে প্রতীয়মান হয়।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর রচিত "রিভিলেশন, রেশনালিটি, নলেজ এন্ড ট্রুথ" গ্রন্থে লিখেন–"পবিত্র কুরআন নাযেল হবার সময় বিশ্ব নিখিলের প্রকৃতি ও স্বর্গীয় সত্ত্বাসমূহের চলন অথবা স্থিতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল চরমভাবে সেকেলে এবং অস্পষ্ট। বর্তমান কালে পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ও বিস্তৃতির পূর্বপর্যন্ত অবস্থা এমনটিই ছিল। নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কতিপয় তত্ত্বকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যখন কতিপয় অন্যান্য তত্ত্ব এখনো আবিষ্কারার্থে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। 'প্রসারমান বিশ্বে'র ধারণাটি প্রাক্তন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় কর্তৃক বিশ্বজনীনভাবে 'সত্য' বলে গৃহীত। এডউইন হাব্‌ল কর্তৃক ১৯২০ সনে প্রথম এটি আবিষ্কৃত হয়। তথাপি প্রায় ১৩ শতাব্দী পূর্বে পবিত্র কুরআনের সূরা জারিয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–"এবং আমরা এক বিশেষ ক্ষমতাবলে আকাশ বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি" (৫১ : ৪৮)।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নিখিল বিশ্বের অবিরত সম্প্রাসারণের ধারণাটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনেরই একচেটিয়া ঘোষণা; অন্য কোন স্বর্গীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে কোন দূরতম ইঙ্গিতও নেই।

এবার আমরা নিখিল বিশ্বের বিশালতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রায়-পরমাণুবিক (Sub-atomic) পর্যায়ের দিকে ফিরে তাকাবো, যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। সব পদার্থই অতিক্ষুদ্র অণুসমূহ দ্বারা গঠিত। পদার্থ হচ্ছে লক্ষ কোটি অণুর সমাহার। একটি অণুতে দুই অথবা তিনটি পরমাণু বিদ্যমান এবং একটি পরমাণুর রয়েছে এক বা একাধিক বিদ্যুতিন, যা আরো এক বা একাধিক হাঁ-ধর্মী বিদ্যুতের একক-সমৃদ্ধ মূল অংশের চারদিকে ঘুরছে।

লক্ষ কোটি তারকা, আমাদের সূর্য, পৃথিবী এবং সব বস্তুগত জিনিষ ও পরমাণূ, যা দিয়ে সেসব তৈরী, সেগুলোর সবই একই ধরনের ক্ষুদ্রতর কণা দ্বারা গঠিত। এই মৌলিক উপদান তথা ক্ষুদ্রতম কণা 'শক্তি' হিসেবেও প্রকাশিত হয়। জানা যায় যে, পরমাণু সমূহ হচ্ছে বিদ্যুতিনসহ ক্ষুদ্রকায় সৌর পদ্ধতি, যা ভীষণ বেগে একটি হাঁ-ধর্মী বিদ্যুতের একক সমৃদ্ধ মূল অংশের চারদিকে ঘুরছে। কোন সংখ্যা দ্বারা এর বিস্তারিত বিবরণ ও বিন্যাস বর্ণনা করা সত্যিই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

১৯৭৯ সনে ১০ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নোবেল ভোজ সভায় প্রফেসর আব্দুস সালাম পবিত্র কুরআনের সূরা মূল্‌ক থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি পেশ করেন,–"তিনিই সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। রহমান খোদার সৃষ্টিতে তুমি কোন অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। এরপর আবার তাকিয়ে দেখ, তুমি কি কোন খুঁত দেখতে পাও"? (৬৭ : ৪)। "অত:পর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ! তোমার দৃষ্টি কেবল ব্যর্থ ও শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে" (৬৭ : ৫)।

আয়াত দু'টোর উদ্ধৃতিদানের পর তিনি বলেন, "কার্যত এটাই হচ্ছে সব পদার্থবিদদের বিশ্বাস। যতই গভীরে আমরা তাকাই, আমাদের বিস্ময় ততই বৃদ্ধি পায়, আমাদের স্থির-দৃষ্টি ততই হতবুদ্ধ হয়।

বিজ্ঞানীরা এখন দেখতে শুরু করেছেন যে, পর্যায় সারণীর গ্রুপের মোল সমূহে একটি ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে, যদিও মূল কাঠামো থেকে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পরাপরমাণু কণা রয়েছে, যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা এখন অবহিত হয়েছেন। "তারতত্ত্বে' (String theory) এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। 'তারতত্ত্ব' মোতাবেক পরমাণুর ক্ষুদ্রাংশগুলো তারের মত ক্ষীণ একমাত্রিক সত্তার মত আচরণ করতে পারে, যা প্রচলিত শূন্যমাত্রিক বিন্দুর ক্ষুদ্রাংশের ধারণা থেকে আলাদা।

এ তত্ত্ব এ বিষয়টি চিত্রায়িত করে যে, একটি তারে যখন কোন নির্দিষ্ট মাপের কম্পন সৃষ্টি করা হয় তখন তা ভর ও চার্জযুক্ত এক ক্ষুদ্রাংশের অনুরূপ আচরণ করে। এ তত্ত্বটি সম্ভবত: প্রকৃতির ৪টি বল (মহাকর্ষ, তড়িৎ-চুম্বক-সবল-শক্তি ও দুর্বল-শক্তি) এবং সব ধরণের বস্তু যে একই যান্ত্রিক পরিমাণে আবদ্ধ, সেই বহু প্রতিক্ষিত 'একীভূত ক্ষেত্র'-তত্ত্বের' Unified field theory-র দিক নির্দেশ করে যে, সব ভর এবং শক্তির উৎস-ই এক। বাস্তব জগতে একটি এককত্ব বিদ্যমান রয়েছে, সেটা অচেতন অথবা প্রাণী-সংক্রান্ত এবং গুল্মরাজ্যের শিক্ষাতেও রয়েছে, আর তা হচ্ছে, একক সৃষ্টিকর্তা ও একক নীতির প্রতি ইশারা।

মহান কুরআনের ভাষায় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে,–"আকাশ ও পৃথিবী এ দু'য়ের মধ্যে যদি আল্লাহ্ ছাড়া আরো উপাস্য থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই বিশৃংখলার কারণে এ দু'টোই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতএব, তারা যা আরোপ করে, আরশের মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ্ তার ঊর্ধ্বে" (২১ : ২৩)।

বিশ্ব নিখিলকে এবার কেউ যতদূর সম্ভব মন:চক্ষুতে দেখুক। এটার বিশালতা এমনই, যা প্রকৃতপক্ষেই অভিভূতকারী এবং পরা পরমাণুবিক অতিশয় ক্ষুদ্রতাসম্পন্ন যা, সম্পূর্ণভাবেই অচিন্তনীয়। সবগুলো অংশই একটি জিনিষ থেকে তৈরী। ওগুলোর সবই অবিরত-কর্মকান্ডে রত এবং সবগুলোর

কাজই এমনভাবে বিন্যস্ত যে, সেগুলো এক সু-সংগঠিত পরিপূর্ণ-বিশ্ব গঠন করেছে।

পিন্ডটি শক্তিতে পরিবর্তনযোগ্য, আর শক্তির বিভিন্ন গঠনও পারস্পরিকভাবে পরিবর্তনযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ–ডঃ আব্দুস সালাম ইলেকট্রো-উইক (Electro weak nuclear force) মতবাদের প্রস্তাব করেন, যেটা দুর্বল পারমাণবিক শক্তি ও তড়িৎ-চুম্বক-বিজ্ঞানের ঐক্য ব্যাখ্যা করে। এ কাজে তিনি যৌথভাবে ১৯৭৯ সনে পদার্থবিদ্যায় স্টিভেন উইনবার্গ ও শেল্ডনলী গ্লাসো-র সাথে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

'ভর শক্তিতে পরিবর্তনযোগ্য'-এ সংক্রান্ত আইনষ্টাইন কর্তৃক প্রদত্ত সমীকরণ, যথা $E=mc^2$ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সম্পর্ক বা সমীকরণকে বর্তমানে তাত্ত্বিক পদার্থ-বিদ্যা ও আধুনিক প্রয়োগ-বিদ্যার ভিত্তি বলে বিবেচনা করা হয়, আর এই সমীকরণকে সাধারণ জ্ঞানের মাত্রায় উন্নতি করার জন্যে বর্তমান সংবাদ মাধ্যমকে অনেক ধন্যবাদ। এই সমীকরণে "ই" হচ্ছে–শক্তি, 'এম'-হচ্ছে-ভর এবং 'সি'-হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতি। যে কোন পদার্থের প্রতিটি গ্রামের মধ্যে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ্য কিলোওয়াট ঘন্টার সমান।

অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশ্ব-নিখিল অথবা এর মধ্যকার প্রত্যেক পদার্থ শক্তিদ্বারা সৃষ্ট। এক কাপ পানিতে ধারণকৃত পরমাণূসমূহ একটি বড় শহরের এক বছরের আলোর যোগানদানের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি ধারণ করে। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা যখন আমরা বিশ্বের সমগ্র শক্তির পরিমাপ করি, তখন যে পরিমাণ শক্তির সন্ধান পাই, সেটা সত্যিই চেতনা-বিনাশী। এমন বিপুল পরিমাণের শক্তি কোন শূন্যতা থেকে উদ্ভুত হয়নি। সৃষ্টি সংক্রান্ত শক্তির উৎস রয়েছে প্রাকৃতিক জগতের সীমার বাইরে।

সৃষ্টির আগে প্রাকৃতিক জগতে অবশ্যই কোন শক্তি ছিল না। সেখানে কি তবে অসারতা অথবা শূন্যতা বিরাজ করতো? কী ছিল তবে সেখানে? উৎস অথবা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তাহ'লে এটা অস্তিত্ব পেল কেমন করে? আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন এসব শক্তি ও তা থেকে যা কিছু শুরু হয়েছে তার সৃষ্টিকর্তা। তিনিই হচ্ছেন সূচনা এবং তিনিই হচ্ছেন সমাপ্তি। পবিত্র কুরআন মতে,–"তিনিই হচ্ছেন আকাশ সমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কিছুর বিষয়ে হুকুম প্রদান করেন, তিনি শুধু বলেন 'হও', আর তা এমনি হয়ে যায়" (২ : ১১৮)। তিনিই হচ্ছেন সব কারণের আদি কারণ।

পৃথিবী মৃত নয় এবং কোন অনস্তিত্ব থেকে আসেনি। অতএব সেখানে বিদ্যমান রয়েছে এক বুদ্ধিমত্তা, আর সেটা হচ্ছে সর্বব্যাপী এবং অভিভূতকারী। মানবজীবনের কমপক্ষে একটি উদ্দেশ্য, সম্ভবত প্রধান অথবা একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই বুদ্ধিমত্তার সাথে সাদৃশ্য হাসিল করা।

সে লক্ষ্যে সংগ্রাম করা এবং মানব মন ও আত্মার শান্তির জন্যে সেই উৎসের সাথে মিলিত হওয়া উচিত। সেই মিলন সংঘটন করাই মানবের কাম্য। এ কাজে সার্থক হলে মানবজাতি এ বিশ্বে আর একাকী থাকবে না। বহু যুগ ধরে মানুষ সেই বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে অবগত ছিল। সব একেশ্বরবাদী ধর্মই এই বিশ্বাসের সাথে একমত। অনেক নামেই একে ডাকা যায়। অনেকে এঁকে 'আল্লাহ্' অথবা 'খোদা' বলে ডাকে। তাঁর রয়েছে অনেক গুণ।

পবিত্র কুরআন বলে, "তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সূচনাকারী ও যথাযথ আকৃতিদাতা। সব সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়" (৫৯ : ২৫)। তিনিই 'আল ওয়াছে'–অর্থাৎ সেই সত্ত্বা, যিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন। 'আল-রহীম', অথবা 'আল-সামী'-যিনি দোয়া শোনেন এবং 'আল-রাজ্জাক' –অর্থাৎ যিনি বিচক্ষণ এবং খাদ্য দান করেন।

খোদার 'আল-ওয়াছে' গুণের বিষয়ে যখন আমরা চিন্তা করি এবং তারপর আমাদের মনেযোগ 'আল-রমীম' ও 'আল-রাজ্জাক' গুণের প্রতি নিবদ্ধ করি, তখন এটা আমাদের দিগন্তসমূহকে প্রসারিত করে। সূরা বাকারায় আমরা পাঠ করে থাকি,–"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে। তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান, এর চাইতেও বাড়িয়ে দেন। এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ" (২ : ২৬২)।

এই উপমা দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, খোদা তাঁর অনুগ্রহ ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাহোক, তিনি (আল্লাহ্) বলেন যে, তিনি (আল্লাহ্) ইচ্ছে করলে এর চাইতেও বেশী দান করতে পারেন। বস্তুজগতের পরমাণু পর্যায়ে এর যে পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা হচ্ছে খোদা আলোর এমন এক বিস্ময়কর যৌগিক গতি দান করেছেন, যা পিন্ড হতে উৎসারিত শক্তির সমান। বস্তুজগতের প্রতিদানের পরিমাণ যদি এরূপ হয়ে থাকে, তবে আধ্যাত্মিক জগতে আমরা কি এ ধরণের প্রতিদানের কোন সাক্ষ্য দেখতে পাই? হ্যাঁ, বাস্তবে আমরা সেটাই দেখি। আমরা দেখি যে, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জীবনে এমনটিই হয়েছে। নিজ জীবনের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর এক কবিতায় বলেন, "আল্লাহ্‌র মহিমা এক ফোঁটা পানিকে একটি নদীতে রূপান্তরিত করেছে। এমনটি ছিল আমার উপর তাঁর দয়ার প্রসার"।

তাঁর পথে যে খরচ করে, সেটার বিনিময়ে খোদা তাকে কেবল আর্থিক প্রবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিই দেন না, মনে শান্তি ও স্বস্তির প্রতিশ্রুতিও দান করেন, যা পেতে মানবাত্মা সংগ্রাম করে থাকে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ হতে রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে নির্ধারিত আছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না"। (২ : ২৭৫)।

প্রসারমান জগতের ছবি, বাড়ন্ত শস্যক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র পিন্ডে সজ্জিত বৃহদায়তনের শক্তির বিষয়টি দ্বারা আমাদের মনকে প্রভাবিত করা প্রয়োজন এবং মাঝে মাঝে তা গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র **'আল ওয়াসে'** ও **'আল রাজ্জাক'** গুণ সম্পর্কে অধিক ধারণা পেতে সহায়ক হবে। এতে দানশীলতার রুহ্ সৃষ্টি হবে এবং আমাদের আত্মার উপর এক স্থায়ী ও গভীর প্রভাব পড়বে। আর কৃপণতা অথবা লোভের মনমানসিকতার পরিবর্তে আমাদের মধ্যে প্রাচুর্যের মানসিকতা অর্জিত হবে। আল্লাহ্‌র আশির্বাদ আমাদের সবার পাথেয় হোক।

ধর্ম বনাম রাজনীতি

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

যারা রাজনীতির সাথে ধর্মকে একীভূত করতে চায় তাদের বক্তব্য হলো, 'দেশের শাসন দন্ড হাতে নিতে না পারলে সেদেশে ধর্মাদেশ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা যায় না।' এজন্যই ধর্মের আঁচল ধরে রাজনীতি করা জায়েয। এটি সম্পূর্ণই একটি অলীক ধারণা। মূলত: ধর্মের নামে যারা ব্যবসা করে তারাই এমনটি বলে। আবার 'ধর্মকে রাজনীতির সামনে বসালে জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয়।' এটি আমাদের এক প্রবীণ রাজনীতিবিদের উক্তি। উক্তিটি অনিবার্যভাবে সত্য, যা আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। একে লক্ষ্য করেই এ বিষয়ে কিছু কথা।

বন্ধুগণ! স্মরণ রাখবেন যে, ধর্ম কখনো রাজনীতির আশ্রয়ে লালিত হয় না। রাজনীতির ছায়ায় কিংবা তার প্রভাবের উপর নির্ভর করে ধর্ম তার প্রসার লাভের আশা করে না। ধর্ম সর্বদাই নিরঙ্কুশ স্বদম্ভে ও স্বশক্তিতেই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পথ চলে। কারণ ধর্ম ঐশী জগতের পবিত্র পরিকল্পনা। স্বয়ং খোদা এর কান্ডারী। সুতরাং, ধর্ম খোদা প্রদত্ত নির্দেশনায় নির্ভীক অদম্য পথে চলে। এর চলন ও বলনকে স্বয়ং খোদা নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই ইহা কখনো রাজনীতিকে আহ্বান করেনা। রাজনীতির সাথে ভাব বিনিময়ের অভিনয় করেনা। রাজনীতির প্রেমে মত্ত হয়না। তার এর প্রয়োজনও নেই। পৃথিবীতে ধর্মাগমনের শুরু থেকেই ধর্ম তার এই অপরিবর্তনীয় নীতি অবলম্বন করে আসছে আর পৃথিবী স্থিতি অবধি সে তার এই নীতি অবলম্বন করেই চলবে। বিলক্ষণ এর ব্যতিক্রম হবেনা।

পক্ষান্তরে রাজনীতি হচ্ছে স্বার্থান্বেষী কিছু লোকের স্বীয় উন্নতির কৌশল পন্থা। প্রহসনমূলক কিছু বাক্য চাতুর্যে নিজ পক্ষে মানুষের একটি দল জুটিয়ে তাদের শিরে বসে তাদেরই সম্পদ লুট করার দুষ্ট প্রয়াস। পৃথিবীতে কতক লোক আছে যারা কিনা একান্তভাবেই সত্য নির্ভর ও নির্মল নির্ভেজাল মনের অধিকারী। যাদের সংখ্যা নেহায়েতই কম নয়। মিথ্যাবাজ প্রবঞ্চক ধুর্ত রাজনীতিবিদগণ সেই তাদেরকেই পুঁজি করে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে স্বীয় ফায়দা লুটতে চায়। এরই অপর নাম রাজনীতি। এই স্বার্থেই তারা ধর্মকে আলিঙ্গন করে আহলাদের সাথে। ধর্মানুসারী সাধুদের আমন্ত্রণ জানায় সাদরে। এই ধুরন্দর স্বভাব বিশিষ্ট লোকদেরই পবিত্র কুরআন জিন্ন বলে আখ্যায়িত করেছে।

তারা বলে দূর থেকে, আর চলে সাধারণদের অন্তরালে। ধর্মানুসারী সহজ সরলমনা এই লোকগুলি জিন্নদের চাতুর্যপূর্ণ কথায় একান্তই প্রলুব্ধ হয়ে স্বীয় নীতি বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা রাজনীতিবিদদের হাতিয়ার হয়ে প্রকৃত ধর্মমতে ঘা দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। তখন তাদের দ্বারা সাধিত এই কার্যাদিকেই বলা হয় 'জঙ্গিবাদ'। জঙ্গীবাদ মূলত: রাজনীতিবিদদেরই অশুভ কর্মের একটি অধ্যায়। ঠিক এই মুহূর্তে ধর্মের আশ্রয়ে রাজনীতিবিদরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে। প্রবীণ রাজনীতিবিদের উক্তির সার বাক্য ইহাই। ধর্মকে রাজনীতির সামনে বসালে অনুরূপ হবে তা অনিবার্য। ধর্মকে নিয়ে রাজনীতির অনেক ঘটনা চিত্রই এই সত্য বক্তব্যের সাক্ষী।

তাই ধর্ম কখনো রাজনীতির আশ্রয়ে আসে না। রাজনীতির আহ্বানে সাড়া দেয় না। তার সাথে আঁতাত করে না, মদদ যোগায় না, তাকে তোয়াক্কাও করে না, তোয়াজও করে না। যে ধর্ম অনুরূপ করে সে ধর্ম, ধর্মই নয়। যে ধর্মানুসারী রাজনীতির ছত্রছায়ায় ধর্মের অমিয়বাণী প্রসারের চেষ্টা করে সে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মাহাত্মকেই বুঝেনি। সে উপলব্ধি করেনি ধর্মের শক্তি কতটা পরাক্রমশালী। সে মোটেই অভ্রান্তের মধ্যে নহে। মূলত: এমনদেরে সংজ্ঞায়িত করা যায় বক-ধার্মিকরূপে। তারা আসলে নামসর্বস্ব ধর্মযাজক। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেই অনুরূপ ধর্ম সেবকের কিছু দল ধর্মের তথাকথিত সেবার দাবীদার। তারা ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাস করে, বোমা ফাটায় আর আত্মঘাতি হামলায় আত্মহনন করে আর নিরীহ মানুষ মারে। ধর্মের সংবিধানে এসব সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অথচ তারা তা-ই করছে।

আমাদের দেশেও তদ্রূপ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কতক ধর্ম যাজকের দল বিদ্যমান। তারা মাথায় চমৎকার টুপী ও মুখমন্ডলে শোভা মন্ডিত শুভ্র দাঁড়ি রেখে সুসময়ে নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ইমামতি করে। কখনো বা পথে নেমে উলঙ্গ রাজনীতি করে, অসময়ে আবার কখনো বা জেলের ঘরে বসে বিভিন্ন অপকর্মের মামলার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। তারাই আবার নিজেদেরকে ধর্মের ধ্বজাধারী রূপে পরিচয় দেয়। রাজনীতি মিশ্রিত ধর্মের রূপ কোন ভাবেই এরচে' ভাল হতে পারে না। তাই ধর্মের সাথে রাজনীতির মিশ্রণ মোটেই শোভনীয় নয়।

ধর্ম হলো স্বর্গীয় নেযামের সুন্দর শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন। প্রত্যেকের জন্য রক্ষিত কল্যাণাধার। ধর্মে এর ব্যতিক্রম আর কিছুই নেই। তাই ধর্ম রাজনীতি থেকে ফারাকে থাকে। রাজনীতির দুষ্ট ষড়যন্ত্রী স্বভাবের প্রভাব হতে নিজেকে স্বাতন্ত্র্য রাখে। যে ধর্মপূজারী রাজনীতির আশ্রয়ে ধর্মের উন্নতির আশা করে তার পালিত ধর্মই তাকে ধার্মিক বলে না। খোদাও তাদেরকে তাঁর ধর্মের সত্যাদর্শ ধার্মিক বলে স্বীকৃতি দেয় না। তারা নিজেদেরকে স্বঘোষিত মু'মিন

বলে সর্বত্র বলে বেড়ায়। মূলতঃ তাদের কর্ম, ধর্মকে সন্ত্রাসীর রূপে উপস্থাপিত করে। তাদের কথিত ধর্মীয় কাজের ভয়ংকর রূপ দেখে অন্যেরা তাকে আলিঙ্গন করতে আসবে দূরের কথা বরং তার ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তাই তারা ধর্মের মানদন্ডে নিন্দীত, নিকৃষ্ট। তাদের যেখানে থাকা দরকার তারা সেখানেই থাকে। সত্য তাদের সাথে যেরূপ আচরণ করার কথা অনুরূপ আচরণই করে।

পৃথিবীতে কম করে হলেও লক্ষাধিক ধর্ম প্রবক্তা এসেছেন। যাঁদেরকে নবী বা রাসূল বলা হয়ে থাকে। তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন খোদা প্রদত্ত ধর্মমত। যাঁরা ছিলেন জাগতিক দৃষ্টিতে অতিশয় নিঃস্ব, অসহায় ও একেবারেই শক্তি সম্বলহীন। এতদসত্ত্বেও তারা নিজ ধর্ম প্রচার কার্যে কোন দিন রাজনৈতিক শক্তির সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখেন নি। সখ্যতা গড়ে তুলেননি। সাহায্য কিংবা রাজনীতির আশ্রয় বা ছায়া যাচনা করেননি। অথচ চির সত্য ইহাই যে, পরিণামে তারা বিজয়ী হয়েছেন। ধর্মের ইতিহাসে এমন একটি নজীরও নেই যে, কোন এক ধর্ম প্রবক্তা রাজনীতির সাহায্য না নেওয়ার কারণে তাঁর ধর্মের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা অকৃতকার্য হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

অসহায় এক শিশু যে কিনা নদীবুকে পাতিলে ভেসে ভেসে ফেরাউনের ঘরে এসে লালিত হলো, সেই নিঃস্ব সম্বলহীন স্বর্গীয় ধর্ম প্রবক্তাও পরিশেষে তাঁরই আশ্রয়দাতা দোর্দন্ড প্রতাপী দেশ নায়ক ফেরাউনের বিরুদ্ধে ধর্ম জেহাদে লিপ্ত হয়ে বিজয়ী হয়েছেন। পক্ষান্তরে জাগতিক সুখ্যাত বীর বিক্রম ফেরাউনের জীবন সাঙ্গ হয়েছে কতনা নির্মমতায় তা কী আর বলার অপেক্ষা রাখে? কায়রোর রাজ শাসনে নিয়ন্ত্রিত যাদুঘরে (museum) সংরক্ষিত তদীয় মরদেহ সেই সত্যেরই সাক্ষী।

খাকসার নিজেও এর একজন সাক্ষী। গত ১৯৯৪ইং সালে সরকারী কাজে সফরে গিয়ে সেই যাদু ঘরে ফেরাউনের মরদেহের মমি স্বচক্ষে দর্শন করে এসেছি। কৈ হযরত মূসা তো তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য কখনো এ ধরণের রাজনীতির আশ্রয়ে যাননি? ফেরাউনের ভয়ে তার সাথে আঁতাত করেন নি?

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। হযরত নূহ (আ.) আপন গৃহ ছেড়ে নৌকায় আশ্রয় নিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.) শূলে বিদ্ধ হয়েছেন। এমনকি ধর্ম জগতের শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের কেউ তো নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের স্বার্থে রাজনীতির আশ্রয় নেননি। রাজনীতির সাহায্য চাননি। এমনকি সমাজের কোন প্রভাবশালী শক্তির মদদ পেতে তাঁরা কখনো তার সাথে সংগোপনে কোন সন্ধি পর্যন্ত করেন নি। কেননা তাঁরা জানতে তাঁদের নেতা তিনিই যিনি সর্বশক্তিমান খোদা "কুন ফাইয়াকুন" শক্তির অধিকারী। তিনি আকাশেরও মালিক জমিনেরও মালিক।

তিনি তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যে সদা নিয়োজিত। তিনি কোন অবস্থাতেই তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে একেলা ছেড়ে দিবেন না। আর এই অভিজ্ঞানই তাঁদের মনে প্রত্যয় দিয়েছিল যে, ফুঁ দিলে যে ঘর ভেঙ্গে যায় সেরূপ দূর্বলতম ঘর অর্থাৎ মাকড়সার বানানো ঘরই এর জন্য যথেষ্ট। এ ঘরই তাঁদেরকে পার্থিব শক্তির সৃষ্ট সকল প্রকার আপদ থেকে রক্ষা করবে। কেননা এমতাবস্থায় অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করাই খোদার কাজ। এরজন্য রাজনৈতিক শক্তির আশ্রয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আর বাস্তবে সেদিন এ বিশ্বাসই সত্যে পরিণত হয়েছে। সেই দুর্বল গৃহ মাকড়সার ঘরই সেদিন শ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠ রাসূলকে সাক্ষাৎ শত্রুর চরম হিংস্রতার ছোবল থেকে রক্ষা করেছিল।

হে বিশ্বপৃষ্ঠের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের ভ্রমে পতিত প্রচেষ্টার বোমাবাজী, অস্ত্র ও ষড়যন্ত্র শক্তি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মোটেও কোন সফলতা আনবে না। বিন্দু পরিমাণও সাহায্য করবে না। একাজ আপনারা অনেক করেছেন, অনেক করিয়েছেন। রাজনীতিকে আশ্রয় করে ভয়ঙ্কর কিছু করেছেন। ফলাফল একেবারেই শূন্য। আপনাদের এ অশুভ কর্ম প্রচেষ্টায় আপনারা নিজেরাও ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন আর ইসলামকেও নিয়েছেন ধ্বংসের চরমে। ফলে অন্য ধর্মাবলম্বীরা এখন ইসলামের আওয়াজটি পর্যন্ত শুনতে চায় না। আপনারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আর ব্যর্থ হয়েছেন শতভাগ। এবার ক্ষান্ত হউন, শান্ত হউন। সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাবে এবার আহমদীয়া জামা'তের দিকে দৃষ্টি দিন। সামনে আসতে যদি লজ্জাবোধ করেন তবে উঁকি গিয়েই না হয় দেখুন, তারা কীভাবে কী করছে! ইসলামের সেবায় ও তার প্রচার প্রসারে কী কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ কাজে আপনাদের অস্ত্র হচ্ছে লাঠি বোমা ও বন্দুক রাইফেল, যদ্বারা কেবলই রক্তক্ষরণ হয়। পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামা'তের অস্ত্র হচ্ছে Love for all - hatred for none

দুশমনের সারি আমি পদদলিত করেছি
অসীর কর্ম আমি মসীতে সেধেছি।

তাহলে আসুন এবং দেখুন এক্ষেত্রে কার অস্ত্র কত ধারালো, কত শাণিত! কার অস্ত্র কতটুকু কার্যকর ও সফলকাম। মনে রাখবেন, মানুষকে মেরে কখনো মানুষের জন্য প্রেরিত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

তাই এই জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর আধ্যাত্মিক পূর্ব পুরুষ খোদা প্রত্যাদিষ্টদের প্রদত্ত অস্ত্র ও আদর্শকে অনুসরণ করেই তিনি বিশ্ব মানবের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্ব ধর্ম ইসলামকে বিশ্বজনের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাচ্ছেন। এসব শক্তি ও সম্পদকে সম্বল করেই তিনি (আ.) বলেছেন, "খোদা আমাকে শত্রুদের সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন। খোদাই তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট। (পুস্তক আল ওসীয়্যত পৃঃ ৩৫-৩৬)।

খোদা আমাকে ধর্মের আন্তরিক উদ্বেগ ও উচ্ছ্বাস দিয়েছেন। সুতরাং আমি আশা করি না যে, আমি বিফল হয়ে মৃত্যু বরণ করব (পুস্তক ফতেহ ইসলাম পৃঃ ৪৬)। সুতরাং হে মৌলভীগণ! খোদার সাথে তোমাদের যদি যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তবে তা কর। কিন্তু খোদা আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামা'তকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদেরকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন।

খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকবো। এমনকি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুঁজবে। এসবই আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা যা টলবার নহে" (পুস্তক তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)। যাঁর মুখনিঃসৃত এসব বাণী, তিনি কি কোন রাজনীতির আশ্রয়ে থেকে এসব বলেছেন? পাকিস্তানের,

ভারতের কিংবা বাংলাদেশের? আমেরিকা কিংবা ইউরোপের? কোন রাজনীতির আশ্রয়ে থেকে অনুরূপ বলা কি সম্ভব? মোটেই নয়। বরং প্রত্যেক দেশের হীন স্বার্থান্বেষী প্রতিটা রাজনীনৈতিক দলই তাঁর (আ.) বিপক্ষে তাঁর মিশনের পথের অন্তরায়। তাই আমি প্রথমেই বলে এসেছি রাজনীতিকে সঙ্গ করে কখনো ধর্ম কর্ম চলেনা। জাগতিক এতসব অন্তরায় সত্বেও যুগ প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ (আ.) বলেন, 'দুনিয়াতে এক সতর্ককারী এসেছে, দুনিয়া তাকে গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং প্রবল পরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তিনি তার সত্যতাকে প্রকাশ করবেন।"

সম্মানিত পাঠকগণের সমীপে বলছি, এসব কী কোন সাধারণ লোকের কথা? না কোন সাধারণ চ্যালেঞ্জ? এসব কি খোদার অনুগ্রহ শূন্য কোন আত্মার কথা? না খোদা পরিত্যক্ত তাক্ওয়া শূন্য কোন অপবিত্র ব্যক্তির কথা?

হে সত্য সত্যই খোদা প্রেমে প্রলুব্ধ পুণ্যাত্মাগণ! বিষয়টিকে সুবিবেচনায় বিচার করুন। বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা পরিত্যাগ করত: সাদা দিলে তা পরখ করুন। খোদার দরবারে পৌঁছে তাঁর সাথে একান্তে পরামর্শ করুন। এ প্রেক্ষিতে এখন আপনাদের কী করা দরকার? ইহা ঐশী জগত থেকে কোন মহাপুরুষের আগমন সংবাদ, যাকিনা যেনতেন কোন সংবাদ নয়। ইহা প্রতিটি মানুষের জন্য সর্ব প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ একটি সংবাদ। যা শুনিবা মাত্র তদ্রূপ বেচৈন হওয়া দরকার যেমনিভাবে কোন মা তার হারানো সন্তানের সংবাদ শুনে বেচৈন হয়ে পড়েন। অত:পর তাকে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রত্যেকের দায়িত্বে বর্তায়।

খাকসার আপনাদের বাড়ি-বাড়ি, গ্রাম-মহল্লায়, শহর বন্দর নগরে ঢোল সহরত করে এই সংবাদই দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তা গ্রহণ করা আর না করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের এক্তিয়ারে। পবিত্র কুরআনও একথাই বলে, "এবং তুমি বল এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে প্রেরিত, সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক'। আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার সামিয়ানা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে এবং যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা (তাহাদের) মুখমন্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল।

(আর) নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাহাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারিত) যাহারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাহাদের প্রতিদান নষ্ট করি না। ইহারাই এমন লোক, যাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহমান থাকিবে.....ইহা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল" (সূরা আল্ কাহ্ফ : ৩০-৩১)।

অতএব, ধর্ম যেভাবে তার প্রসার ও প্রচার চায়, তাকে লালন করার পদ্ধতি শিখায়, তাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়, আসুন, আমরা সেই পদ্ধতি অনুসরণেই তাকে লালন ও পালন করি, তার প্রসার ও প্রচারের চেষ্টা করি। তবেই ধর্ম হবে মানুষের জন্য কল্যাণকর, মানুষের প্রশান্তির আশ্রয়স্থল।

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন: "আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও ঈদুল আযহিয়া

মাহমুদ আহমদ সুমন

ঈদুল আযহিয়া মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বা বড় ঈদ। ঈদুল আযহিয়ার নাম রাখার কারণ হলো এটি কুরবানীর ঈদ। এ ঈদ যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ হজ্জের ইবাদতের শেষে উপস্থিত হয়। (হজ্জ ৯ তারিখে হয়)। অনেকে এই ঈদকে 'বকর ঈদ' বা বকরী ঈদও বলে থাকেন। হযরত রসূল করীম (সা.) এই ঈদকে ঈদুল আযহিয়া বলেই উল্লেখ করেছেন।

ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করার গুরুত্ব ব্যাপক। যদিও সামর্থহীন অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী ওয়াজীব নয় কিন্তু সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব। হযরত (সা.) 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে নিজেও কুরবানী করতেন এবং তার সাহাবীদেরকেও কুরবানী করার জন্য তাগিদ দিতেন। এই ব্যাপারে হাদীসে অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন যে, আঁ হযরত (সা.) হিজরতের পর মদিনায় দশ বৎসর অবস্থান করেন এবং তিনি প্রতি বৎসরই 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষ্যে মদীনায় কুরবানী করতেন" (তিরমিযী)। শুধু তাই নয়, 'ঈদুল আযহার' কুরবানীর প্রতি তাঁর (সা.) এতদূর খেয়াল ছিল যে তিনি ওফাতের পূর্বে তাঁর জামাতা ও পিতৃব্য পুত্র হযরত আলী (রা.)কে ওসীয়্যত করেন যে, তাঁর পরেও (ওফাতের পর) যেন তাঁর পক্ষে ঈদুল আযহা' উপলক্ষ্যে সর্বদা কুরবানী করা হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, "হযরত হাবসা (রা.) বলেন যে, তিনি হযরত আলীকে দেখলেন 'ঈদুল আযহা'-য় দুটি দুম্বা কুরবানী করছেন। তিনি হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, "দুই দুম্বা কুরবানী করার কারণ কি? হযরত আলী (রা.) বললেন যে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওসীয়্যত করেছেন যেন তিনি তাঁর পক্ষে তাঁর ওফাতের পরেও কুরবানী করতে থাকেন। এই জন্য তিনি হযরত রাসূল (সা.) এর পক্ষে কুরবানী করেন" (আবু দাউদ)।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরবানী সম্পর্কে বলেন ঃ খোদা তাআলা ইসলামী শরীয়তের মাঝে বহুবিধ আহকাম ও অনুশাসনের দৃষ্টান্ত ও নমুনা স্থাপন করেছেন। সুতরাং মানুষের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, সে যেন তার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা এবং তার সমস্ত অস্তিত্ব সহকারে খোদা তাআলার পথে উৎসর্গীকৃত হয়। এতএব, বাহ্যিক কুরবানীগুলোকে উক্ত নির্দেশকৃত অবস্থার জন্য নমুনা বা প্রতীকস্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এই কুরবানী বা আত্মোৎসর্গই বটে। যেমন কিনা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'লাইঁ ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়া লা দিমাউহা ওয়া লাকিইঁ ইয়ানালুহুত্ তাক্ওয়া মিনকুম।' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবানীগুলোর মাংস পৌঁছে না এবং সেগুলোর রক্তও পৌঁছে না।

কিন্তু তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে থাকে। অর্থাৎ তাঁকে এত ভয় কর যেন তাঁর পথে মৃত্যুই বরণ করো এবং তোমরা যেমন নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবাই করে থাক, তেমনি ধারায় তোমরাও খোদার পথে যবাই হয়ে যাও। যখন কোন তাক্ওয়া এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে, তখন প্রতীয়মান হবে যে, তা এখনও অপূর্ণ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ঈদুল আযহিয়ার খুতবার এক অংশে বলেন- "কুরবানীর গোশ্ত আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৌঁছায় না।" (সূরা হজ্জ, ৩৮ আয়াত) কুরবানীর ব্যাপারে খোদা গোশ্তের বুভুক্ষ নন। খোদা পাওয়ার জন্য 'তাক্ওয়া' চাই। তিনি আমাদেরকে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাবার একটা উপায় শিক্ষা দিয়েছে। 'অধম উত্তমের জন্য কুরবানী করবে।' তাক্ওয়া তবেই লাভ করা যায়, যদি সীমাতিরিক্ত প্রশংসা না করা হয়। ধর্ম-জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু জ্ঞানলালনকে, শিক্ষা কার্যকর করাকে উপরে স্থান দিবে। আমি শুধু শিক্ষার্থীদেরই বলছি না। এখানে যারা আছেন, সকলেই জ্ঞান অন্বেষণ করছেন। সকলেই শিক্ষার্থী। এ খুতবাও এক শিক্ষা। দেখুন, খোদাতাআলা হযরত ইবরাহীম আলইহিস্ সালামকে আদর্শরূপে উপস্থিত করছেন এবং বলছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্মকে 'আত্মঘাতি' ছাড়া কেউ ছাড়তে পারে না। ইব্রাহীম আলইহিস্ সালামকে খোদা তাআলা সম্মানিত করেছেন। তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আত্ম-সংস্কারকের অন্যতম।

সারা দুনিয়া কুরবান করে দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা করতে হবে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম কত বড় কুরবানী করেছিলেন যে, খোদাপ্রেম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট 'মাহবুব' বলে দেখা যাচ্ছ। যে কুরবানী করে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন।

কুরবানীর দৃশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। নিজ নিজ আমল (কর্ম) পরীক্ষা করুন। কথা, কাজ, আনন্দ, আচরণ ও লোকের সাথে মেলামেশা সব বিষয়ই ভেবে দেখুন অধমকে উত্তমের জন্য বর্জন করছেন কিনা? যদি করেন, তবে 'মুবারক' (ধন্য)। ত্রুটিযুক্ত কুরবানী আমাদের ছাড়তে হবে। আপনাদের কুরবানীতে কোন প্রকার খুঁত যেন না থাকে। শিং-কাটা, কান-কাটা না হয়। কুরবানীর জন্য তিন দিন। যে আধ্যাত্মিক কুরবানী করে, সে জানে সবই তার জন্য সমান। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, ৩ জানুয়ারী, ১৯০৯)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ঈদুল আযহিয়ার খুতবার এক অংশে বলেন-

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্মরণে আজ কুরবানীর ঈদ; আমি কয়েকবারই বলেছি যে, জনসাধারণ যেভাবে বলে থাকে, হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানী সেই রকমের ছিল না। লোকে বলে থাকে, হযরত ইসমাঈল (আ.) কে জবেহ্ করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁকে জমীনে শায়িত করেছিলেন, কিন্তু পরে খোদা তাআলার কাছ থেকে ইলহাম পেয়ে জবেহ্ করবার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্র ইঙ্গিতে তাঁর স্থানে এক দুম্বা জবেহ্ করেছিলেন। আমি বার বার বলেছি যে, প্রকৃত অর্থে হযরত ইসমাঈল (আ.)কে মক্কার মরু প্রান্তরে ছেড়ে আসবার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কারণ পানি ও তরুলতাহীন প্রান্তরে বসতি স্থাপন করা এক মস্ত বড় কুরবানী–উদাহরণস্বরূপ যেমন দেখা যায় রাবওয়া মোকামে প্রথম প্রথম কতিপয় ব্যক্তি তাবু খাঁটিয়ে একে আবাদ করবার জন্য

বসে গিয়েছিলেন। ঐসব ব্যক্তি প্রকৃত ভাবে তখন ইসমাঈলী সুন্নত পুরা করেছিলেন। তাদের এখানে বসবার একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, রাবওয়া যেন শীঘ্রই আবাদ হয়ে যায়। যদি তারা কুরবানী না করতেন এবং রাবওয়া মোকামে এসে বসতি স্থাপন না করতেন, তাহলে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হতো না, এখানে বাজারও বসতো না, ঘরবাড়ীও স্থাপন হতো না এবং এই জায়গা পূর্বের মতই শূন্য প্রান্তর রয়ে যেতো।

....মোট কথা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর বিষয়টি ভুল আকারে প্রচারিত করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর স্বপ্নের অর্থ ছিলো যে তিনি স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে যে মক্কা জল ও তরুলতাহীন এক প্রান্তর এবং যেখানে কোন আহার্য বস্তু পাওয়া যায় না– সেখানে যেন তিনি আপন স্ত্রী ও পুত্রকে ছেড়ে আসেন। তিনি এমনই করলেন। যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় হলেন, তখন তিনি তাঁর সাধুতা ও সততার দ্বারা নিজের চারদিকে এক দল লোক জমা করে নিলেন এবং তাদেরকে নামায, যাকাত, সদকা এবং খয়রাত বিষয়ে শিক্ষা দেন। ওমরা হজ্জের পন্থা প্রতিষ্ঠা করে মক্কাকে আবাদ করতে আরম্ভ করেন। তদনুযায়ী তাঁর কুরবানীর ফলে শত শত বর্ষ থেকে মক্কা আবাদ হয়ে আসছে।

সুতরাং ঈদুল আযহিয়া কুরবানী নিঃসন্দেহে উক্ত কুরবানীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এটা সেই কুরবানীর স্মরণে নয় যাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বাহ্যিকভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ঈদ আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন খোদার উদ্দেশ্যে এবং তারপর ধর্মের জন্যে জঙ্গলে প্রান্তরে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে খোদা তাআলার নাম ঘোষণা করি এবং মানুষকে তাঁর রসূলের কলেমা পড়াই যেভাবে আমাদের সম্মানিত সূফীগণ করে এসেছেন। যদি আমরা এমন করি তাহলে আমাদের কুরবানী হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর সমতুল্য হবে। (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ পাক্ষিক আহমদীর সৌজন্যে)

অতএব আসল কুরবানী হতো তা, যা মানুষ নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করে থাকে আর এটাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ঈদুল আযহিয়া আমাদেরকে এটাই শিখায়। অতএব দেখে নাও যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (রা.) কে এক পানি বিহীন মরুভূমিতে ছেড়ে আসলেন (১৪: ৩৮) তখন যদিও তিনি স্বয়ং সেই মরুভূমি থেকে বাইরে চলে গেলেন কিন্তু তাঁর কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে আলাদা রেখে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের স্বামীর পৃথক হওয়ার কারণে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন। আর নিজের পুত্রের কষ্ট দেখেছিলেন এবং পুত্রের কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের ইচ্ছায় এমন এক মরুভূমিতে বসবাস করলেন যেখানে অনেক দূর দুরান্তেও মানুষ দেখা যেত না। তিনি একাই কেবল ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করেননি বরং মা-বাবার কষ্টও দেখেছেন। অতএব সেই কুরবানী কোন একক ব্যক্তির ছিল না। হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত হাজেরা (রা.) ও ইসমাঈল (আ.)কে এক পানি প্রভৃতি শূন্য মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে এক কুরবানী করতে হয়েছিল। আমি মনে করি প্রকৃতই আজ প্রত্যেক মুসলমান যদি এ অর্থে ঈদ পালন করতে থাকে আর দুম্বা ও ছাগল কুরবানীর সাথে সাথে নিজেদের আর নিজেদের সন্তান সন্ততির কুরবানী করতে থাকে তহলে বিশ্বের কোন শক্তি তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না।

ঈদুল আযহিয়া আমাদের মাঝে এরকম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে চায়। আমরা আমাদের মাঝে যদি ইব্রাহীমি আত্মা সৃষ্টি করে নেই আর পাকিস্তানীরা খোদার পথে মৃত্যুকে বরণ করে নেয় তাহলে তারা অবশ্যই পৃথিবীর ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্ত্রী ও পুত্রের কী হবে এর কোনই পরওয়া করেন নাই সেভাবে তাদের স্ত্রী পুত্রের কী হবে পাকিস্তানীরাও এটা মনে করবে না। খোদা তাআলা যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে পানিবিহীন মরুভূমিতে ছেড়ে আসার আদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি এ প্রশ্ন করেননি, হে খোদা! সেখানে তাদের কিভাবে চলবে।

বরং তিনি কোন প্রশ্ন না করে খোদা তাআলার আদেশ পালন করেছিলেন আর বলেছিলেন, তারা ক্ষুধায় মারা গেলে মরুক গে। রোদ্রে পুড়লে পুড়ুক গে। আমাকে খোদা তাআলার আদেশ পালন করতেই হবে। পাকিস্তানীদের মাঝে যদি এ আত্মা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাদের স্ত্রী পুত্রের মরতে হলে মরতে দিতে হবে। তারা জন্মভূমির সুরক্ষার খাতিরে কোন প্রকার বাহানা দেখাবে না। তাহলে দেখতে থাক সফলতা কিভাবে তাদের পদচুম্বন করে। এভাবে এ আত্মা আমাদের জামাতের লোকদের মাঝেও যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আমাদের তবলীগ খুবই ব্যাপকতা লাভ করতে পারে.....।

.....অতএব তোমরা এমন ঈদ উৎসব পালন কর যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। পরে দেখবে, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণরাশি কিভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে। খোদা তাআলার রসূল (সা.) এর প্রতি দুরূদ পাঠাও আর বার বার দুরূদ পড় যা নামাযে তোমাদেরকে শিখানো হয়েছে। (১৯ জুলাই, ১৯৫৬ রাবওয়ায় প্রদত্ত, আল ফযল, ১০ জুন, ১৯৫৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ঈদুল আযহিয়ার খুতবার এক অংশে বলেন- আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সকলের জন্য এ ঈদ এ রঙ্গে মুবারক করেন যে, এ ঈদের সাথে যে সকল কুরবানী ও আত্মত্যাগের সম্পর্ক এবং ঈদের ফলশ্রুতিতে কুরবে ইলাহী (ঐশী নৈকট্য) প্রাপ্তির যে সকল পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে তা যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য খুলে দেন এবং স্বীয় রহমত ও কল্যাণরাজী দ্বারা আমাদের অবিষিক্ত করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এক রুইয়া (স্বপ্ন) দেখেন এবং তদনুযায়ী এটা বাহ্যতঃ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)কে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বল্লেন যে, তোমাকে স্বপ্নে যে আদেশ দান করা হয়েছে, তা সন্তানের বাহ্যিক হত্যা বা আত্মহত্যা নয় বরং নফ্স এবং সন্তানের কুরবানীর নির্দেশ বহণ করে। মৃত্যুর বিবিধ রূপ ও আকার প্রকৃতি আছে। মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায় অথবা কোন ঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়, ইত্যাদি ভিন্ন কারণে জীবন সূত ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে মৃত্যু শাহাদত রূপে আসে কিংবা যে মহান কুরবানী হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিকট চাওয়া হয়েছিল, তার মোকাবেলায় অপরাপর মৃত্যু কোনই মর্যাদা বা মূল্যবোধ রাখে না। এতদভিন্ন প্রত্যেক মৃত্যুই এক সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ব্যাপার, কিন্তু এটা আজীবন ও সার্বক্ষণিক মহান কুরবানীর ব্যাপার, যা মানবাত্মা, তার বিবেক ও আবেগে এক আলোড়ন এবং জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমরা এক স্বর্গীয় উপকরণ স্বরূপ 'যিবহে আযীম' বা মহান কুরবানীকে নির্ধারণ করেছি। ইহা এক দিকে যেমন যিবহে আযীম, অন্যদিকে নাযাতেরও কারণ। ইহা মৃত্যুও বটে, আবার জীবনেরও উৎস। সেজন্য "তারাকনা আ'লাইহে ফিল আখেরীন" আমরা এ রীতিকে পরবর্তী জাতিসমূহেও পরিচালিত করেছি, এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তা চরম শিখরে উপনীত হয়....।

আল্লাহ্ তাআলার এটাই ফয়সালা যে, সকল মানুষকে একই পতাকার নীচে সমবেত করা হবে। পতাকা হলো হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা। সমগ্র মানবজাতিকে, তারা দুনিয়ার যে কোন দুর-দুরান্ত অংশেই বাস করুক না কেন, একমাত্র হাত বা মুঠির মধ্যে একত্রিত করা হবে। সেই হাত ও মুঠিই হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ও মুঠি, যার সম্বন্ধে খোদা তাআলা বলেছেন যে, ওটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত নয় এটা আমার হাত। খোদা তাআলার এ হাতের প্রভাব ও পবিত্র শক্তি, ক্ষমতা ও পরাক্রম বর্তমানেও ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হবে যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ বুনিয়াদী সত্য এবং এ শুভ সংবাদ, আমরা যারা আহমদীয়াতের দিকে আরোপিত হই, আমাদের নিকট কুরবানী চায়–সেই কুরবানী, যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্রগণ এবং বংশধরগণ খোদা তাআলার সমীপে পেশ +করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহানী পুত্র ও সন্তানগণের নিকটও সেই কুরবানীরই তাকীদ ও দাবী জানায়। এ কুরবানীর জন্য আপনারা প্রস্তুত হন, যাতে আপনারা আল্লাহ্ তাআলার হুকুমত ও কল্যাণরাজীর ওয়ারিশ হতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত কুরবানী পেশ করার তৌফিক দিন। (১৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩ মসজিদে আকসা, রাবওয়া, সাপ্তাহিক বদর, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)- ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ঈদুল আযহিয়ার খুতবার এক অংশে বলেন- আমরা যে পশু কুরবানী করে থাকি তা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এটা ভুলে যাই যে, প্রত্যেক এই কুরবানীর মাঝে এক পয়গাম (গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা) নিহিত থাকে। আর মৌলিক ও মোক্ষম পয়গাম হচ্ছে এই যে, এইসব কুরবানী (পশুর) মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে যাবে না। তা তোমরা নিজেদের মধ্যেই বন্টন করবে। বড় জোর গবীব ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে তার কিছুটা কল্যাণ সাধন করবে এবং এর বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে। অথবা নিজেদের নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জনদের মাঝে মাংস বন্টন করবে। আর ধারায় 'ইতায়ে-যিল্‌কুরবা' (আত্মীয়স্বজনকে দান করার ন্যায় অন্যদেরকেও দান করা) সম্পর্কীয় আদেশটির কিছুটা বাস্তবায়ন ঘটবে। (তাতে সন্দেহ নেই)। কিন্তু এসবই তোমাদের নিজেদের (সীমিত গন্ডীতে) ফায়দার বিষয়। বস্তুত: কুরবানী প্রদানকারী ব্যক্তির তাক্‌ওয়া (খোদা ভীতি ও প্রীতিমূলক আন্তরিক নিষ্ঠা) খোদা তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে থাকে। আর এই কুরবানীগুলি যদি তাকওয়া শূন্য হয়, তাহলে এগুলো হয়ে থাকে নিরেট গতানুগতিক প্রথা। এরচে বেশী এগুলোর কোনই মূল্য নেই। আমি অনুভব করেছি, অধিকাংশ কুরবানী প্রদানকারী পশু যবাই পর্যন্তই নিজেদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং মনে করেন যে, ঐদিন তারা কেবল কতগুলো পশু কুরবানী দিয়ে যাতে এর ফায়দা উঠাতে পারেন। অথচ কুরবানীর যে (যবাই করা সংক্রান্ত আত্মোৎসর্গের) রূহ্ বা চেতনাবোধ রয়েছে, তা তাদের অন্তরে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে ও তা তাদের হৃদয়কে স্পর্শও করে না। অথচ এর মাঝে এক পয়গাম নিহিত রয়েছে। বস্তুত: সে পয়গামটি ইঙ্গিত দিচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দিকে। তিনি (আ.) যে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে অবিচল উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন পিতা ও পুত্র (আলায়হুমাস্ সালাম) উভয় নিজ নিজ ভূমিকা পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং ঐভাবে নিজেদের কুরবানী দিতে আল্লাহ্‌র সমীপে সমর্পণ করেছিলেন, সেই কুরবানীরই স্মৃতি বহন করে থাকে ঈদুল আযহার এই কুরবানী।

(ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ০৪/০৪/১৯৯৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর খামেস (আই.)- ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ঈদুল আযহিয়ার খুতবার এক অংশে বলেন ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষ্যে আজ এবং কালকে পৃথিবীতে অগণিত প্রাণী জবাই হবে। কিন্তু এই কুরবানী এবং ঈদের আনন্দ এটাই কি একমাত্র এর উদ্দেশ্য? ছাগল, ভেরা যা জবাই করা হবে, কাবাব বানানো, খাওয়া, বন্ধু-আত্মীয়স্বজনকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা এটিই কি কুরবানীর উদ্দেশ্য? এটি কি এমন কাজ, যে কাজে আল্লাহ্ অনেক বেশি সন্তুষ্ট হতে পারেন? বা আল্লাহ্ কি মুসলমানদের বলেছেন যে, আমি আজকে তোমাদের প্রতি একান্ত আনন্দিত, তোমরা ছাগল, ভেরা, গরু বিভিন্ন প্রাণী জবাই করছো তাই।

শুধু ঈদগাহে এসে দুই রাকাত ঈদের নামায পড়াই কি যথেষ্ট? আর ইচ্ছা বা অনিচ্ছ সত্বেও খুতবা শুনে নিলাম তারপর ঘরে ছুটে গেলাম আর বিভিন্ন প্রাণী জবাই করবো আর মাংস খাবো। ...তো জবাই করার পর আমরা যদি মনে করি আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি বা করে ফেলেছি। এটা মনে করা যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানে আমি দেখেছি, আমরা ঈদের নামায পড়ে যখন ফিরে আসতাম তখন দেখা যেত যে অনেকেই ঈদের নামাযের ৫/৭ মিনিট পরেই অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের ভিতরেই নিজেদের কুরবানীর পশু জবাই করে ফেলত। এর মধ্যেই দেখা যায় অনেকে গাভীর চামড়াও পৃথক করে ফেলেছে, মাংস কাটতেও দেখা যায়। এতে বুঝা যায় এরা হয়তো ঈদের নামায পড়ে না বা খুতবা শুনে না। কুরবানী পশু জবাই নিয়ে তারা চিন্তিত থাকে যে আমরা তাড়াতাড়ি যাব আর কুরবানীর পশু জবাই করে মাংস খাব।

....কুরবানী করার পিছনে কেবল এটিই উদ্দেশ্য নয় যে পশু কুরবানী করতে হবে তারপর তার মাংস খেতে হবে বরং এই কুরবানী ঈদের পিছনে কুরবানীর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে এবং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী সন্তানও এ কুরবানীতে অংশ নিয়েছেন। আর যার চূড়ান্ত পরিনতি বা পরিসমাপ্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্তায় ঘটেছে এবং তাঁর সাহাবীরাও (রা.) তাঁর কল্যাণ থেকে অংশ লাভ করে এর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে এটি দেখতে হবে প্রতি বছর ঈদ আসে তাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক মান কিভাবে উন্নত করতে পারি। আমাদের কুরবানীর মান আমরা কিভাবে উন্নততর করতে পারি নতুবা আল্লাহ্ তাআলা তো আমাদের এই ছাগল, দুম্বা, গরু জবাই করার প্রতি তো কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সে উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণকারী দেখতে চান। নতুবা এ পশু কেবল জবাই করার উদ্দেশ্যে করা হয় কুরবানীর উদ্দেশ্যে নয়।

আল্লাহ্ তাআলার যে নির্দেশ তার ওপর পুরোপুরি আমল করার জন্য প্রস্তুত থাকা আর প্রস্তুত হওয়ার জন্য বড় থেকে বড় কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার জন্য প্রস্তুত হওয়া। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জবাই হওয়ার জন্য আনন্দের সাথে সানন্দে নিজের ঘাড়কে পেশ করা কামেল ভালবাসাকে চায় এবং কামেল ভালবাসার জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। ইসলাম শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করে যে সত্যিকারের ত্যাগের বা কুরবানীর জন্য কামেল অন্তর্দৃষ্টি এবং কামেল ভালবাসার প্রয়োজন অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

..... আমাদের এইসব পশু কুরবানী তখনই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে যখন কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করা হবে। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন, ২০-১২-২০০৭)

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত অর্থে ঈদুল আযহার গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

খিলাফতই ঐক্যের একমাত্র পথ

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের জন্য খিলাফতই ঐক্যের একমাত্র পথ বা ব্যবস্থা। খিলাফতের ছত্রছায়া ব্যতিত মুসলমান কখনোই একতা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। যতদিন না জাতি ঐশী খিলাফতের নিয়মতে অন্তর্ভুক্ত হবে ততদিন মুসলমানরা পদে পদে অপমান, অপদস্ত, অত্যাচার, নির্যাতন ও নানাবিধ ঐশী গযবের মধ্যে পতিত হবে। একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থাপনাই পারে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে। খিলাফত কোন মানুষ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ নয়। খিলাফত মহান সৃষ্টিকর্তার দেওয়া মু'মিনের জন্য এক বড় নেয়ামত। যারাই এই নেয়ামতের যথাযথ কদর করবে শুধুমাত্র তারাই এর ফল বা নেয়ামত ভোগ করবে। অতীতের ইতিহাস থেকে আজ পথহারা, দিশেহারা, হতভাগা, ফতোয়াবাজী লেবাসধারী, ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদীরা যদি শিক্ষা না নেয় তাহলে এক সময়ের বাংলার মাটি কাঁপানো গোলাম আযম, নিযামী, সাঈদী ও আমিনীদের যে পরিণতি হচ্ছে অনুরূপ পরিণতিও ধর্মান্ধ ফতোয়াবাজদের কাঁপলে ঘটতে পারে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধে যেভাবে আল বদর, আল সামস্ বাহিনী বাংলার নীরিহ মা-বোনদের উপর যুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে ছিল স্বধীনতার ৪০ বছর পরও কি তা কমেছে? না কমেনি। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পরে ফতোয়াবাজদের কবলে পরে কত মা-বোন নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছেন। এমন ধরনের নির্যাতন চালানো হয় যা বর্বরতাকে হার মানায়। এর সবকিছুই হচ্ছে এ কারণে মুসলমানরা আজ কুরআন হাদীস এর শিক্ষাও নবী করীম (সা.) এর আদম্য থেকে দুরে সরে নিজেদের মনগড়া শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার কারণে।

ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ আনুগত্য ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এর শিক্ষা দেয়। ইসলাম কখনো অশান্তি অরাজকতা ও বল প্রয়োগে বিশ্বাস করে না। আর খিলাফতও জোর-জবরদস্তি বা মিটিং মিছিল করে তৈরী করা যায় না। খিলাফতের সাথে ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র সম্পর্ক রয়েছে। যতদিন মু'মিন মুসলমানরা ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখবে ততদিন তারা খিলাফতের কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৭ম রুকুতে আল্লাহ্ তাআলার এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আজ পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মত কোন ঐশী নেতা নেই। যে যার মত পারছে বিভিন্ন মতপথ অবলম্বন করছে। মুসলমানদের মাঝে ঐক্য বা একতা সৃষ্টি করার কোন পরিকল্পনাও কারো মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। শত বিভাগ মুসলিম আজি ঐশী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর এরজন্য দায়ী ধর্মীয় লেবাসধারী মত পার্থক্য সৃষ্টিকারী ফতোয়াবাজ মোল্লা মৌলবীরা।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তুমি বল, আল্লাহ্ ও এই রাসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আলে ইমরান : ৩৩) যারা আজ বড় বড় নামধারী মওলানা সেঝে আছেন তাদের চিত্র দেখুন কুরআনের এই শিক্ষা থেকে কতদুরে। কুরআনের শিক্ষা কি আর তারা করছে কি। তাদের কারণেই সাধারণ দুর্বল অসহায় মুসলমানরা এর ভুক্তভোগী। আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও (সূরা নিসা : ৬০) ঈমানদের আনুগত্যের প্রতি বিশেষ জোর প্রদান করেছে। আজ যদি সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে সুন্দর একটি ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অন্যান্য ধর্মীয় ফেরকার মাঝে একটি ফেরকা। আহমদীয়া সদস্যদের দাবী কুরআন ও হাদীস এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক একমাত্র এ জামাতেই ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা জারী আছে। যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) দিয়েছেন। "খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের" পদ্ধতিতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাহ্‌দী ১৯০৮ সনে ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সনে ২৭ মে আলহাজ্জ মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতই এর প্রমাণ বা সাক্ষ্য বহন করছে। খিলাফতের আজ ১০৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। যদি সতিকার অর্থে এটি ঐশী খিলাফত না হতো তাহলে তা অনেক আগে ধ্বংস প্রাপ্ত হতো। যেমন মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল হাক্কাতে বলেছেন, "আর সে যদি কোন মামুলী কথাকে (ও) মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতো। তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম। এবং আমরা অবশ্যই তার জীবন শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমদের কেউই (আমাদের ক্ষতি থেকে) তাকে রক্ষা করতে পারতো না (সূরা হাক্কা : ৪৫-৪৮)। কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগকে আখেরী যামানা বা যুগ বলা হয়েছে। এই আখেরী যুগে যিনি মসীহ্ মাওউদ নামে আখ্যায়িত হয়েছেন আর তারই নাম খাতামাল খোলাফা ও রাখা হয়েছে। সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যদি মিথ্যাদাবীকারক হতেন তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ও তার জামাতকে অনেক আগেই ধ্বংস করে দিতেন। আজ পৃথিবীর প্রায় ২০০টি দেশে আহমদীয়া খিলাফতের অধীনে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতি বছরই এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আহমদীরা কারা যারা বিশেষ এক খলীফার আনুগত্যে ইসলামের কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌র" বাণী প্রচার করছে। অপরদিকে অন্যান্য ফেরকার আলেম ও সাধারণ লোকেরা এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকে আহমদীয়া জামা'তের বিরোধিতায় লিপ্ত, কিন্তু তাদের এই বিরোধিতাই আমাদের প্রচারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যা তারা অনুধাবন করতে পারছে।

খিলাফতের দ্বারা আহমদীদের মাঝে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে তা রদ করা কারো পাক্ষে সম্ভব না। খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তাআলার ঐশী সাহায্য রয়েছে। হযরত নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত উমর (রা.) রাঙা তলোয়ার নিয়ে বলেছিলেন যে, যে বলবে নবী করীম (সা.) মারা গেছেন তার শিরোচ্ছেদ করা হবে। যেই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কে খলীফা বানিয়ে পতন:নুখ ইসলামকে পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করছেন যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করেন এবং ইসলামের শিক্ষার উপর যাদের বিশ্বাস আছে তাদেরকে খোজ করার দরকার কোথায় সেই শান্তি, কোথায় সেই ঐক্য, কোথায় সেই একতা। ১২৩ বছর আগে এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন একমাত্র সেই জামা'তেই ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা চালু আছে। অবক্ষয়ে

জর্জরিত মুসলিম জাহান যদি নিজেদের মাঝে ঐক্য, একতা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে হিংসা, অহংকার মনোভাব পরিহার করে একমাত্র ঐশী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আহমদীয়া খিলাফতের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া উচিত। আর নিজেদের ভিতর এক আমুল পরিবর্তন সাধিত করা। তবেই সম্ভব হবে পথহারা পথিকদের পথের দিশা মেলা সম্ভব। প্রথমেই শিক্ষিত সমাজ, আলেম ওলামা, মাশায়েখদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যাদের উপর নির্ভর করে জাতি আজ পথ চেয়ে বসে আছে। তারাই যদি সঠিক পথের সন্ধান না পান তাহলে সাধারণ উম্মতেরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং দিন অতিবাহিত হচ্ছে, সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, মাহ্‌দীর যুগের লক্ষণাবলী আরও আগেই প্রকাশ পেয়েছে তবুও যদি হুশ না হয়, তাহলে অমান্য করার দায়ে সবাই আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির ভাগীদার হবে। প্রবাদে আছে "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়" তাই সময় থাকতেই সচেতন হওয়া জাগ্রত হওয়া উচিত।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের দ্বারা মুসলমানরা যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তা থেকে বাঁচার জন্য একতা ও ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। অপরদিকে মুসলমানরা যেভাবে দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যাচ্ছে এতে করে একত্রিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া নেয়ামতের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বিধর্মীদের মোকাবেলা করা উচিত। নিজেদের মাঝে ইসলামী নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে জগতের সামনে তুলে ধরতে হবে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। মানবতা ও সাম্যের ধর্ম হলো ইসলাম। যদি মুসলমানদের মধ্যে সেই আখলাক ও চরিত্র ফুটে উঠে তাহলেই বিধর্মীরা মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সত্যিকার ধর্ম ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হবে। আজ যেভাবে বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসাতে ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ শিখানো হচ্ছে তা প্রতিহত করা সত্যিকার মুসলমানদের দায়িত্ব। নামে মুসলমান সার্টিফিকেটই লাগিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করে নিজেকে বড় মু'মিন মনে করা উচিত নয়। মু'মিন সে যার মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে। খোদাভীতি থাকলো কখনো খারাপ কাজ বা পাপ করতে পারে না। মুসলমানরা আজ পাপের রাজ্যে বাস করছে। মিথ্যার দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদ, ঘুষ খাওয়ার প্রবনতা দিন দিন বেড়েই চলছে। এগুলো থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে না পারলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। শুধুমাত্র খায়রে উম্মত দাবী করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় নি। খায়রে উম্মতের নমুনা নিজের ভিতর তৈরী করতে হবে। নাম সর্বস্ব মুসলমান হয়ে কোন লাভ নেই। প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সুধী পাঠক, একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ঐশী খিলাফত নবুওয়ারে পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কেউ যদি মনে করে আমরা ভোটের মাধ্যমে খলীফা বানাবো তাহলে সেটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে। এ ব্যাপারে সূরা নূরের ৫৬নং আয়াত ভাল করে পড়া উচিত। ঐশী খিলাফত হচ্ছে মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত সেই কল্যাণময় ব্যবস্থাপনা যা মু'মিনগণকে সর্বদা আধ্যাত্মিক জীবনের সুধা দিয়ে সিক্ত রাখে আর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নতির পর উন্নতি দিতে থাকে। এছাড়া খিলাফত জাতীয় জীবনে ঐক্যের প্রতীকও বটে।

আদি থেকে আল্লাহ্ তাআলার এটিই রীতি যে, যখন পৃথিবী পথ ভ্রষ্টতা এবং অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়েছে তখনই আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুদের হেদায়াতের জন্য তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তিদের নবুওয়াত ও রিসালতের মুকুট পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ সকল নবী রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে হেদায়াতের চারা রোপিত হয়েছে। বস্তুত: তাদের এ পৃথিবীতে আগমন আল্লাহ্ তাআলার সত্তার প্রথম বিকাশ হয়ে থাকে। অত:পর যখন কোন নবী বা রাসূল পৃথিবী থেকে বিদায় হন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের সমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য তাঁদের স্থলাভিষিক্তদের পাঠান আর এটি আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের দ্বিতীয় বিকাশ হয়ে থাকে।

মু'মিনগণ সমষ্টিগত ভাবে ঈমান ও যুগ উপযোগী সৎ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নির্ধারণ করেন যা পক্ষান্তরে খোদা তাআলারই নির্বাচন হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছায় নির্বাচিত ঐ ব্যক্তি সেই নবীর কাজকে খোদার সাহায্যের চাদরে আবৃত থেকে এগিয়ে নিয়ে যান। নবী রাসূল প্রেরণের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তাআলার এ রীতিই জারী আছে। বস্তুত: নবুওয়াত ও খিলাফত একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গঅঙ্গিভাবে জড়িত। বরং বলা যায় নবুওয়াত ছাড়া খিলাফতের ধারা অসম্ভব।

অত:পর উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খিলাফত সত্যিকার অর্থে ঐশী খিলাফত। জাতি মানুক আর না মানুক এতে কোন কিছু যায় আসে না যুগে যুগে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে জাতির লোকেরা অস্বীকার করছে এতে কি নবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়নি? বরং বার বার নবীর জামা'তই বিজয় লাভ করেছে। বিগত ১৪ শত বছরের ইতিহাস নিয়ে যদি ভাবি তাহলে এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, পবিত্র কুরআন সূরা নূরের ৫৬নং আয়াত ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াত (৬১০-৬৩২ খৃ:) তার নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো মুসলমানদের ইতিহাসের ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(ক) "খিলাফতে রাশেদা" তথা প্রথম চার জন খলীফার যুগ (৬৩২-৬৬১ খৃ:)

(খ) উমাইয়া শাসকদের অত্যাচারমূলক রাজতন্ত্রের যুগ (৬৬১-৭৫০ খৃ:)

(গ) জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যবাদী যুগ, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যবাদ (৭৫০-১২৫৮ খৃ:) এবং ওসমানীয়া সুলতানী আমল (১২৫৮-১৯০৮ খৃ:)।

(ঘ) অত:পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুন:প্রতিষ্ঠিত এ ইসলামী খিলাফতের যুগ যা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেয়য়ামতকাল পর্যন্ত জারী থাকবে। বাস্তব ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খিলাফতের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে (১৯০৮-২০১১ চলমান) এবং আহমদীয়া জামা'ত ব্যতিত অন্য কোথাও ঐশী প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের কোন অস্তিত্ব নেই।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আর তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র রাজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)। নবী করীম (সা.) স্পষ্টবঅবে জানিয়ে দিয়ে গেছেন যাদের মধ্যে এ মহান ব্যবস্থা অর্থাৎ নবুওয়াতের পদ্ধতিতে ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের গুণাবলী কি হবে। তিরমিযী কিতাবুল ঈমানে বলা হয়েছে, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সে পথে যে থাকবে। সুতরাং সাহাবাগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করেছেন তদ্রুপ ভাবে আহমদীগণ ও সর্বান্তকরণে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন।

ঐশী খিলাফতের সুশীতল ছায়া থেকে আহমদীরা আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"র বাণী ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ছড়ানোর কাজে লিপ্ত। অথচ তথাকথিত আলেম ওলামা তাদেরকেই অমুসলমান কাফের আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষা কি আর মোল্লারা করছে কি?।

মহান আল্লাহ্ তাআলা এই সমস্ত আলেম ওলামাদের শুভ বুদ্ধি দান করুন এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐশী খিলাফতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন আমীন।

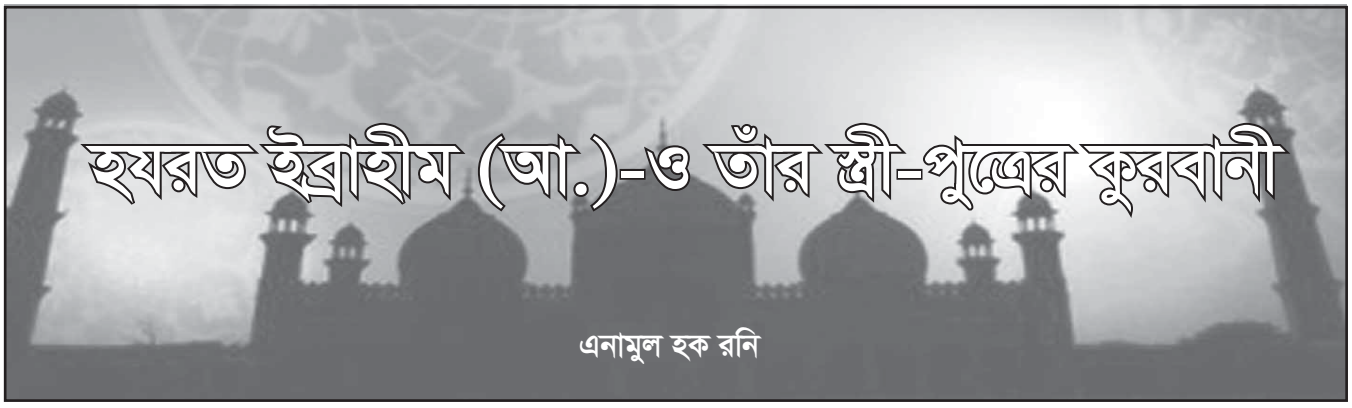

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কুরবানী

এনামুল হক রনি

হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তাআলার এক প্রিয় রাসূল ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'ইব্রাহীম ছিল বড়ই কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও সহিষ্ণু। (সূরা আত্ তাওবা-১১৪ আয়াত) তাই মহান আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ধমাদর্শে অনুসরণ করতে বলেছেন। যেমন, 'আর ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উত্তম কে, যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। (সূরা আন নেসা-১২৬) এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ বন্ধুত্ব লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। আর তাই তিনিও আল্লাহর নিকট নিজকে সম্পূর্ণভাবে সপে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

পাক কালামে ইরশাদ করা হয়েছে, 'নিশ্চয় আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করছি, যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরেকদে অন্তর্ভূক্ত নই।' (সূরা আল আনআম-৮০)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে পেতে সারা জীবন ব্যাপী কুরবানী উপস্থাপন করে আসছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি (আ.) একজন সন্তানের জন্য শেষ বয়সে আল্লাহ্ তাআলার নিকট এভাবে দোয়া করছিলেন, 'রাব্বি হাবলি মিনাসসালেহীন' অর্থ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎকর্মশীল (উত্তরাধিকারী) দান কর।' (সূরা সাফফাত : ১০১)। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এই দোয়া খোদা তাআলা কুবল করেছিলেন এবং জবাব দিলেন, 'ফাবাশ্ শারনাহু বিগুলামিন হালিম।' অর্থ তখন আমরা তাঁকে এক পরম সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (সূরা সাফফাত ১০২) আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের পরপরই এই প্রিয় পুত্র পিতার সান্নিধ্যে বেশী দিন থাকতে পারলেন না।

প্রিয় পুত্র ও স্ত্রী হাজেরাকে আল্লাহর আদেশে মক্কার জনমানবশূন্য নির্জণ উপত্যকায় কুরবানী দিতে হলো। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইসমাঈলের মা (হাজেরা) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু (ইসমাঈল) কে নিয়ে মসজিদের উচ্চ ভূমিতে জমজমের স্থানে একটি প্রকান্ড গাছের নীচে বসলেন। সে সময় মক্কায় কোন জনবসতি কিংবা পানির ব্যবস্থা ছিল না। আর তিনি তাদের কাছে এক ঝুড়ি খেজুর ও এক মশক পানি রাখলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে রওনা হলেন ইসমাঈলের মা (হাজেরা) পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন, হে ইব্রাহীম? আপনি আমাদেরকে এ জনমানবহীন উপত্যকায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে তো বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ কিছুই নাই। তিনি বার বার কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করছিলেন এবং সবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ্ কি আপনাকে এমনটি করার নির্দেশ দিয়েছেন? হযরত ইব্রাহীম (আ.) শুধু বললেন, হ্যাঁ। তখন ইসমাঈলের মা বললেন, 'তাহলে আল্লাহ্ আমাদের ধ্বংস করবেন না। তিনি স্ব স্থানে ফিরে আসলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদের থেকে দূরে 'সানিয়' নামক স্থানে এসে কাবার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করালাম। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা যেন নামায কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট করো এবং তাদেরকে ফলফলাদির রিযক দান করো যেন তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে (সূরা ইব্রাহীম : ৩৮)

এরপর ইসমাঈলের মা বুকের দুধে নিজ সন্তানকে লালন পালন করতে থাকলেন। কিছু দিনের মধ্যে গচ্ছিত খাবার ও মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। তিনি নিজে এবং সন্তান পিপাসায় কাতর হয়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকলেন। তিনি তার পুত্রের এ অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারছিলেন না। সেখান থেকে সাফা পাহাড় নিকটেই ছিল তিনি সেই পাহাড়ে উঠলেন দেখলেন দূরে কোথাও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু কাউকে না পেয়ে সেখান থেকে নেমে আসলেন সন্তানের কাছে একটু দূরে 'মারওযা' পাহাড় এর উপরে উঠলেন দেখলেন দূরে কোথাও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু কাউকে পেলেন না। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে দৌড়ালেন। এই কারণেই হজ্জের সময়ে লোকেরা এদু'টি পাহাড়ে সাতবার সাঈ (দৌড়ায়) করে থাকে। ইসমাঈলের মা শেষবার যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন তখন কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জমজমের কাছে একজন ফেরেশ্‌তাকে পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখলেন আর এভাবে পানির ঝর্ণা বের হচ্ছিল। তিনি এ পানি থেকে নিজে পান করলেন এবং সন্তানকে দুধপান করালেন। ফেরেশ্‌তা তাকে বললেন, আপনি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় করভেন না কারণ এখানে আল্লাহ্‌র ঘরের স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। যা এই সন্তান ও তার পিতা নির্মাণ করবেন।

এভাবে মা ও সন্তানের বেশ কিছু দিন কেটে গেল। হঠাৎ বনী জুরহুম গোত্রের লোকরো এ পথ ধরে 'কাদা' নামনক স্থান হতে আসছিলেন। তারা এখানে পানির সন্ধান পেলেন। পানির কাছে ইসমাঈলের মা বসে ছিলেন। কাফেলার লোকেরা জিজ্ঞাসা

করলেন, আপনি কি আমাদেরকে এখানে এসে অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে পানির উপর তোমাদের কোন মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। তারা বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ইসমাঈলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা অন্তরঙ্গ ও সহানুভূতি সম্পন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা। এরপর ইসমাঈল যৌবনে পদার্পণ করলে তাদের সাথে একত্রে বসবাস করার ফলে আরবী শিখে নিলেন। তাঁরা তার সুস্বাস্থ্য ও চেহারা আর সুরুচী পূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন। তাদের এক মহিলার সাথে বিয়ে করালেন। বেশ কিছু দিন কেটে যায় ইতিমধ্যে ইসমাঈলের মা ইন্তেকাল করেন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রের খবর নিতে মক্কায় আসেন কিন্তু প্রথমে পুত্র বধুর সাথে তাদের কুশলাদী জিজ্ঞাসা করে পুত্রকে না পেয়ে উপদেশ দিয়ে যান ঘরের চৌকাঠ পরিবর্তন করতে। পুত্র ইসমাঈল ফিরে এসে পিতার আদেশে চৌকাঠ পরিবর্তন বলতে স্ত্রীকে ত্যাগ করেন এবং ঐ গোত্রের অপর মহিলাকে বিবাহ করে। পুনরায় পিতা আসলেন ঘটনাক্রমে সে দিনও পুত্রের সাথে দেখা হলো না। পুত্র বধুর কাছে তাদের জীবন যাত্রা কিরূপ চলছে খোঁজকবর নিলেন। সব শুনে পিতা দোয়া করলেন তাদের খাবার ও পানির জন্য। আর পুত্রের জন্য উপদেশ দিলেন ঘরের চৌকাঠের যেন হেফাজত করে। পুত্র ফিরে এসে পিতার আদেশে ঘরের চৌকাঠ অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক আরো সুর্দঢ় করলেন।

এভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অনেক দিন আর এদিকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর আসা হয়নি। একদিন ইসমাঈল জমজম কুপের নিকট একটা গাছের নীচে বসে তীর ঠিক করছিলেন এমন সময় হযরত ইব্রাহীম (আ.) আসলেন। ইসমাঈল পিতাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এগিয়ে গেলেন পিতা-পুত্রের সৌজন্য সাক্ষাৎ হলো। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সন্তানকে বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটা কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল বললো, আপনার প্রভু আপনাকে যে কাজের হুকুম দিয়েছেন তা পালন করুন। তিনি বললেন তুমি আমাকে এ কাজে সাহায্য কর। পুত্র বললো, হ্যাঁ, আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবো। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ্ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন একথা বলে একটি উঁচু টিলার দিকে ইশারা করে বললেন, এর চারদিকে ঘর নির্মাণ করতে হবে।

অত:পর তাঁরা এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। ইসমাঈল পাথর বয়ে আনতেন আর ইব্রাহীম (আ.) তা দিয়ে ভিত্তি গাঁথতে থাকলেন। চতুর্দিকের দেয়াল অনেকটা উঁচু হয়ে গেলে ইব্রাহীম আলায়হে সালাম এই পাথরটা এনে (মাকামে ইব্রাহীম) এর উপর দাঁড়িয়ে ভিত্তি গাঁথতে থাকলেন। আর ইসমাঈল পাথর এনে যোগান দিতে লাগলেন। পিতা ও পুত্র উভয়েই ঘর তৈরীর সময় দোয়া করলেন, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন। আপনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন। (সূরা বাকারা : ১২৮) [বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকে]

এভাবে পিতা ও পুত্রের মিলিত প্রচেষ্টা ও দোয়া আল্লাহ্ তাআলা কবুল করলেন। আর কাবাঘর নির্মিত হলো আর মানুষের মিলিত হওয়ার স্থান হিসেবে কাবা নির্ধারিত হলো।

এমনই পিতা-পুত্রের কুরবানীর দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যেমন, 'এরপর সে যখন তার দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌঁছলো সে বললো, হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখে থাকি আমি তোমাকে জবেহ করছি অতএব চিন্তা কর (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি? সে বললো হে আমার পিতা! তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তুমি তাই কর। আল্লাহ্ চাইলে তুমি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবে।

এরপর তারা উভয়েই যখন (আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সামনে) আত্মসমর্পন করলো ইব্রাহীম আলায়হে সালাম তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল আলায়হে সালামকে জবেহ করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন ।

তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম। হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমরা এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাঁকে বাঁচালাম। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাঁর সুখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখলাম। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা আসসাফ্‌ফাত : ১০৩-১১০)

এ আয়াতগুলি থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুত্র ইসমাঈলকে বাহ্যিকভাবে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্রকে জবেহ করছেন এ স্বপ্ন তিনি বার বার দেখে আসছিলেন কিন্তু একথা তাঁর সন্তানকে বুঝবার বয়স হলে তারপর জানালেন যে, তাঁকে জবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ নির্দেশকে আক্ষরিকভাবে পালন করার জন্য যখন প্রস্তুত হলেন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (ইব্রাহীম) বাহ্যিক বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখলেন। আর এভাবে বুঝিয়ে দিলেন তুমি পূর্বেই অর্থাৎ যখন কিনা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে পানিশূন্য জনমানবহীন উপত্যকায় ছেড়ে এসেছিলে তখনই স্বপ্নের নির্দেশ পূর্ণ করা হয়েছিল। তাই আর এখন বাহ্যিকভাবে পুত্রকে জবা করার প্রয়োজন নাই।

এই আয়াতগুলিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইসমাঈলকে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে যে অবিচল নিষ্ঠা ও সংকল্প ও প্রস্তুতি দেখিয়েছে তা মানব ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে ইসলামে আনুষ্ঠানিকতার রূপ দেয়া হয়েছে। আর এর মাধ্যমে সে সময়ের নরবলী প্রদানের কুপ্রথা চীরতরে বন্ধ করা হয়েছে। তাই আজ সারা বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মাতা হাজেরার কুরবানীকে স্মরণ করে হজ্জব্রত পালন করে ও ঈদুল আযহিয়া পালন করে। লক্ষ লক্ষ কুরবানী পেশ করে তাদের স্মরণীয় করে রাখে। আর আমরা মুসলমান হিসাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এ সুখ্যাতি কখনও ম্লান হতে দিতে পারি না।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাই ইব্রাহীম (আ.)-এর এ সুন্নতকে জারী রাখার জন্য নিজে কুরবানী পেশ করতেন। আর অন্যদেরকে জারী রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই প্রতি বছর জিলহজ্জ মাসে তাঁদের শিক্ষণীয় ত্যাগ তিতীক্ষা ও নিজের সত্তার কুরবানীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরাও হজ্জব্রত পালন ও ঈদুল আযহা পালন করে থাকি। এভাবে আমাদের কাছে তারা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহান আল্লাহ্ তৌফিক দিন সত্যিকার যে কুরবানী যা ইব্রাহীম (আ.) পেশ করে ছিলেন সেরূপ কুরবানী যেন আমরাও করতে পারি, আমীন।

ইসলামে জেহাদ

সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

জেহাদ বলতে অনেকেই ধর্মের নামে ঢাল তলোয়ার কামান বন্দুক বোমা বাজি ইত্যাদি দ্বারা শক্তি বা বল প্রয়োগে মানুষকে মেরে রক্তপাত ঘটানো তালেবানী সন্ত্রাসকে ধর্ম যুদ্ধ বা জেহাদ বুঝে থাকেন। তাদের মতে যেহেতু নবী করীম (সা.) যুদ্ধ করেছেন, তাই তারা করছে। ভেবে দেখার বিষয় এই যে, হযরত নবী করীম (সা.) কোন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করেছিলেন। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়েও যখন তিনি শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিস্তার পেলেন না, সেই অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ করে বলেন, "আল্লাহ্‌র পথে তোমরাও যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘণকারীকে ভালবাসেন না"। (সূরা আল বাকারা)

হযরত নবী করীম (সা.) আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছিলেন এটা আক্রমাণাত্মক ছিল না। যদি তিনি সেই সময় শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিহত না করতেন তাহলে তিনি টিকে থাকতে পারতেন না। শক্তি খাটানো, বল প্রয়োগ, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতার নাম ইসলাম নহে।

"লা ইকরাহা ফিদ্দীন" ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। এই ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। মানুষ নিজেই তার বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে ক্রীড়া কর্মের পরিণাম চিন্তা করে গ্রহণ ও বর্জন করবে। কর্মেই জীবন গড়ে জান্নাত ও জাহান্নাম। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের বিবেক ও ইচ্ছা স্বাধীনতাকে হরণ করেন নি।

সত্য মিথ্যা ভাল মন্দ সুস্পষ্ট পার্থক্য মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর যে কেউ সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, হক বাতীল, যে কোন একটাকে গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কেও এই অধিকার দেন নি, যাতে তিনি জবরদস্তি হিদায়াত দাতা মালিক বলে যান স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে পাঠিয়েছেন 'সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী' হিসেবে। ইসলাম মানুষকে সত্য সরল ও সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়।

বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা খাঁটিয়ে গ্রহণ করার দায়িত্ব মানুষের নিজের। এক আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এবং তারই ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। মানুষ আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ্ তাআলা আসমান জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তৎসমুদয় সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে তখনই সার্থক হয়, যখন মানুষ আল্লাহ্ তাআলার বিধান অমান্য করার শক্তি যা তাকে দেওয়া হয়েছে তার মোহে অহমিকাগ্রস্থ না হয়ে, তার সেই শক্তিকে আল্লাহ্‌র বিধান পালনের কাজে ব্যবহার করে। মানুষ যেমন সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়, তেমনি আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই শক্তির অপব্যবহার করে আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘণ করে চলতে থাকে, এমতাবস্থায় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট জীব পশুত্বের সর্বনিম্নস্তরে নেমে যায়। তখনই সমাজের বুকে নেমে আসে মিথ্যা, অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, জোর যুলুম দলাদলি রেষারেষি হানাহানি, মারামারি, খুর খারাবি ইত্যাদি পশু সুলভ নিকৃষ্ট ক্রীড়াকর্ম।

এই অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী তাঁর বান্দাদেরকে পশুত্বের সর্বনিম্নস্তর থেকে উদ্ধার করে মানবতার উচ্চাসনে উন্নতি করে আল্লাহ্ তাআলার খাঁটি মানুষে পরিণত করার নিমিত্তে কোন একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে ধরাধামে আবির্ভূত করেন। বর্তমানেও এইরূপ নৈতিক আধ্যাত্মিক অধ:পতনের যুগেও আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ও মানবকুল শ্রেষ্ঠ শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে দলে দলে শতধা বিভক্ত মুসলমান জাতিকে সত্যের ডাক দিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'ধর্মযুদ্ধ' রহিত ঘোষণা করলেন। আর বর্তমান যুগে ধর্মের জন্যে কেউ যুদ্ধ করে না যুদ্ধ করে মসনদ ও ক্ষমতা লাভের আশায়।

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। জিহাদর নামে তালেবানী নামক সন্ত্রাসী ক্রীড়া কর্ম কখনো ইসলামের শিক্ষা নয়। তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারবে না। তাহলে ইসলাম মিথ্যা হয়ে যাবে। পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, "তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও"। (সূরা আলে ইমরান) প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, মু'মিন কারা? আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র 'রজ্জুকে' শক্তভাবে ধরবে, আর আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে তারাই হবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনগণকে মহা পুরস্কার দিবেন।" (সূরা নেসা)।

উপরোক্ত আয়াতে 'রজ্জু' অর্থ সূরা নূরে বর্ণিত খিলাফত। যার পবিত্র বন্ধনে মুসলমান জাতির একতা ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পর স্নেহ প্রাণঢালা মহব্বত অটুট থাকবে। আল্লাহ্ তাআলার খিলাফতকে যারা শক্তভাবে ধারণ করে চলবে তারাই হবে প্রকৃত মু'মিন মুসলমান এবং তারাই হবে আল্লাহ্ তাআলার মহাপুরস্কার প্রাপ্ত ভাগ্যবান বিজয়ী। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে নেতাবিহীন দলে দলে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতির মধ্যে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতকে মানা বা না মানার মধ্যেই মুসলমান জাতির কল্যাণ বা পতন নির্ভর করছে।

ইসলামী জিহাদ সমূহকে সাম্রাজ্য লিপ্সা সাম্রাজ্যবাদীতার যুদ্ধের মত ধারণা করা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। মুসলমানগণ মিসর জয় করে আরো পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু শক্তি থাকা সত্ত্বেও পাশের

ইথিওপিয়ার উপর কোন আক্রমণ চালানো হয়নি বা দখলের প্রয়াস নেননি। কারণ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন এবং সাম্রাজ্য লিপ্সাকে ইসলাম ঘৃণা করে। তাই পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "তিলকা দারুল আখিরাতু নাযয়ালুহা লিল্লাযিনা লা ইউরিছুনা ওলু ওয়ান ফিল আরদে ওয়ালা ফাসাদা ওয়াল আখিরাতু লিল মুত্তাকি।" (সূরা কাসাস) অর্থাৎ এই আখিরাতে আবাস তা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে দাপট ও আধিপত্য প্রদর্শন করতে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় না।

তাই ইসলামের প্রথম যুগ থেকে দেখা গেছে, মুসলমানগণ যেখানেই গিয়েছেন সকলকেই ভাই বলে গ্রহণ করেছেন। এমনকি যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের প্রতিও স্নেহ মমতা এবং সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাদের ধর্মীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোন রূপ হস্তক্ষেপ করেননি। বরং শাসন কার্যে সম অধিকার দিয়েছেন। ইসলাম নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও ঠিক তাই পছন্দ করে।

একদা হযরত রাসূল করীম (সা.) যুদ্ধ জয় করে ফিরার পথে সাহাবী (রা.)দেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমরা ছোট যুদ্ধ শেষে বড় যুদ্ধের দিকে যাচ্ছি" সাহাবা (রা.) গণ জানতে চাইলেন–বড় জিহাদ কোনটি? উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন, "রিপুর কুপ্রবৃত্তিকে জয় করার যুদ্ধ"। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে কামনা, বাসনা, লোভ লালসা ইত্যাদি রিপু রয়েছে, এগুলিকে বশিভূত করে আত্মশুদ্ধি লাভ করা। মানুষের মধ্যে কতগুলি গুণ বা স্বভাব রয়েছে। কামনা বাসনা লোভ লালসা চতুস্পদ জন্তুর স্বভাব ছলনা প্রতারণা ধোঁকাবাজি শয়তানের স্বভাব। বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা ফেরেশ্‌তার স্বভাব।

মানুষের কাছে শূকর ও কুকুর ইহাদের আকৃতির জন্য নিন্দনীয় নহে বরং এদের প্রকৃতিই এদের নিন্দার কারণ। অপবিত্র ও জঘন্য জিনিষের প্রতি লোভ শুকরের স্বভাব। হিংসা, দ্বেষ ঝগড়া, কলহ, স্বজাতি বিদ্বেষ কুকুরের স্বভাব। ছল চাতুরী ধোকাবাজী শয়তানের স্বভাব। বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা ফেরেশ্‌তার স্বভাব। হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি শয়তান নির্দিষ্ট আছে। আমার জন্যও একটি শয়তান আছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তার উপর আমাকে জয়ী করেছেন। শয়তান আমার অধীন হয়ে আছে। যে আমাকে ভাল ছাড়া কোন মন্দ আদেশ দেয় না।" সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষের কর্তব্য তার লোভ লালসারূপ-শুকর ও ক্রোধ রূপ কুকুরকে বশিভূত করে নিজের বিবেক বুদ্ধির অধীনে রাখবে।

তবেই তার সৎ স্বভাব সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। আর যদি নিজেই কাম ক্রোধ লোভ লালসার অধীন হয়ে যায়, তাহলে তার দুর্ভাগ্যের সীমা পরিসীমা থাকবে না। বুঝা গেল যে, মানুষ যদি কাম ক্রোধ লোভ লালসা ইত্যাদির অধীন হয়ে যায়, তাহলে প্রকাশ্যে তারা মানুষ হলেও সৃষ্টির সেরা সেই মানুষই আবার পশুত্বের সর্বনিম্নস্তরে চলে যায়।

অতএব পুশুত্বের সর্বনিম্নস্তর থেকে নৈতিকতার স্তরে উন্নীত হয়ে আধ্যাত্মিকতার ক্রমোন্নতির সোপানে আরোহনই হলো ইসলামী জিহাদ।

আহমদীয়াত-খাঁটি ইসলামের অপর নাম

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি এসে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য ১৮৮৯ (১৩০৬ হিজরী) সনেআল্লাহ্‌র আদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। বর্তমানে এই ঐশী জামা'ত বিশ্বের ১৯৮টি দেশে একক ঐশী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে রত।

বাংলাদেশের মাটিতে এই ঐশী জামা'ত ১৯১২ সালের শেষে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এদেশে শত শত শাখা-উপশাখায় এ জামা'ত বিস্তৃত। এর দেশীয় কেন্দ্র ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত।

মহানবী (সা.)-এর আদেশ অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নিকট বয়আতকারী আহমদী তরীকার মুসলমানরা আজ সারা পৃথিবীতে এক মহান আধ্যাত্মিক জেহাদে রত। আপনি কি বিষয়টি যাচাই বাছাই করে আপনার ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন ?

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(ষষ্ঠ কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

সাড়ে চার বছর লন্ডন ও জার্মানীতে আহমদীয়া জামা'তের খেদমত করে জানুয়ারি ১৯২৫ সালে স্বদেশ ফিরে আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে অন্য কোন চাকুরি করার জন্য আদেশ দেন। অত:পর তিনি ১৯২৫ সালে মালদহ জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পূর্বে চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরির প্রেক্ষিতে তিনি এই পুন:নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল এডুকেশন সার্ভিস (BPES) এর অধীনে ২৬০-৭০০ টাকার বেতন স্কেলে মাসিক ৩০০/= টাকা মূল বেতনে তাঁর চাকুরি শুরু হয়। তখন স্কুলের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। স্কুল সার্বিক উন্নয়নে অনেক গতিশীল হয়। লন্ডন ও জার্মান ফেরৎ মানুষ গড়ার কারিগরের প্রচেষ্টায় অসংখ্য সোনার ছেলে গড়ে উঠে। ভাল ফলাফলে অনেক সুনাম অর্জন করে। তখন তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী কাজ করেন। যা ইতিহাসে মাইলফলক সৃষ্টি হয়ে আছে। নিম্নে এর কয়েকটি আলোকপাত করা হলো :

(১) সেকালে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে টিফিন দেয়ার প্রচলন ছিল না। ফলে ছাত্রদেরকে সকালের পর থেকে বিকাল পর্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকতে হতো। এতে পেটের ক্ষিধায় তাদের অনেক কষ্ট হয়। ছাত্রদের প্রতি অনেক স্নেহস্পর্শী মানবদরদী প্রধান শিক্ষক এটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি স্কুলে দুপুরে ছাত্রদের মাঝে টিফিন দেয়ার প্রবর্তন করেন। মাসিক মাত্র চারি আনা টিফিন ফি'র মাধ্যমে উন্নত মানের টিফিন দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ছাত্রদের পেটের ক্ষিধার কষ্টের লাগব হয়। লেখাপড়ায় শক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

স্কুলে এ নতুন ব্যবস্থার প্রচলন প্রত্যক্ষ করে স্কুল ইন্সপেক্টর খুশী হন। হেড মাষ্টার সাহেবের অনেক প্রশংসা করেন। বিষয়টি তিনি শিক্ষা বিভাগের পরিচালককে অবহিত করেন। তখন পরিচালক সাহেবের উপলব্ধি হয় এটা একটি প্রয়োজনীয় ও মহৎ কাজ। তাই তিনি সকল সরকারি স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে টিফিন দেয়ার আদেশ দেন। পরে বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলও চালু করে। মোবারক আলী সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত টিফিন প্রদানের এ ব্যবস্থা বঙ্গদেশের শিক্ষিত মহলে আলোচিত হয় এবং প্রশংসা লাভ করে।

(২) পাক ভারত বিভক্তির পূর্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং শিক্ষিত সমাজে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী ছিল। তাই শারদীয় দূর্গাপূজার জন্য স্কুল এক মাসের অধিক বন্ধ দেয়া হতো। কিন্তু মুসলমানদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে একদিন বা দুই দিনের বেশী বন্ধ দেয়া হতো না। ধর্মের উত্তম সেবক মোবারক আলী সাহেব এটা উপলব্ধি করে অত্যন্ত ব্যথিত হন। এ বৈষম্য দূর করার জন্য ভাবেন। তাই একবার স্কুলে হিন্দু মুসলমান সকল শিক্ষকদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। তিনি হিন্দু শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে বলেন–আপনাদের পূজার ছুটি সাত দিন কমিয়ে এবং গ্রীষ্মের ছুটি সাত দিন হ্রাস করে রমযান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে পনর দিন ছুটি এবং অন্যান্য ছুটি হতে সাত দিন হ্রাস করে ঈদুল আজহার ছুটি সাত দিন করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে একদিকে মুসলমানদের যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সুবিধা হবে তেমনি হিন্দুদেরও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে কোন অসুবিধা হবে না। এতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বছরে মোট ৮৫ দিন ছুটির কোন পরিবর্তন হবে না। হিন্দু শিক্ষকরা তা শুনে উত্তরে বলেন, আমাদের শারদীয় পর্ব উদযাপন উপলক্ষ্যে যে ক'দিন ছুটি প্রয়োজন সে ক'দিন ছুটি হলে আমাদের আপত্তি নেই। অত:পর হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্র শিক্ষকের শ্রদ্ধাভাজন ও অধিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক গুরু মালদহ জেলা স্কুলের ছুটি হ্রাস বৃদ্ধি করে রমযান ও ঈদুর ফিতরের ছুটি পনর দিন এবং ঈদুল আজহার ছুটি সাত দিন প্রবর্তন করেন। এই বিষয়টি শিক্ষা বিভাগের উর্ধতন মহলে গোচরীভূত হবার পর প্রশংসিত হয়। কর্তৃপক্ষ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উদযাপন উপলক্ষে সর্বত্র সাত দিন করে সরকারি ছুটির আদেশ জারি করেন। ফলে এই ছুটির ঘটনা ইতিহাস সৃষ্টি করে।

(৩) তখন স্কুলে আরবি ও পার্শি ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং উক্ত ভাষা শিক্ষার জন্য স্কুলে পৃথক দুইজন শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। যাদের মাতৃভাষা উর্দু নহে তারা মাতৃভাষার সাথে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু শিখতে পারতো। হেড মাষ্টার মোবারক আলী উপলব্ধি করলেন ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের মাতৃভাষা উর্দু। তাছাড়া এদেশের বিভিন্নাঞ্চলে পার্শি অপেক্ষা উর্দু বেশি প্রচলিত। কাজেই স্কুলে পার্শি ভাষা শিক্ষার পরিবর্তে উর্দুভাষা শিক্ষা বেশি প্রয়োজন। তাই বিষয়টি তিনি স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেবের নিকট পেশ করেন। তখন ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে তা কার্যকরী করার জন্য

পরামর্শ দেন। অত:পর ম্যানেজিং কমিটির মঞ্জুরীক্রমে এটা স্কুলে বাস্তবায়ন করা হয়। মালদহ জেলা স্কুলে তার প্রবর্তিত এই বিষয়টিও প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে সরকারীভাবে বিভিন্ন স্কুলে চালু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক মোবারক আলী সাহেব কর্তৃক প্রবর্তিত এবং বিভিন্ন মহলে বাস্তবায়িত এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্কুলের লেখাপড়াসহ সার্বিক উন্নয়ন উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায়। তাই এ আদর্শবান শিক্ষকের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা, সততা এবং বংশ মর্যাদা প্রভৃতি যথার্থভাবে মূল্যায়ণ করে তখন বৃটিশ সরকার তাঁকে 'খান সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৩৫ সালে এ পান্ডিত্যের প্রধান শিক্ষক বগুড়া জেলা স্কুলে বদলী হন। নিজের অধ্যয়নকৃত স্কুলেই তাঁর বিদ্যা দানের সুযোগ হয়। ফলে স্কুলটিকে তিনি আপন মনে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তোলেন। ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক গুরু হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে দেখা যায় ১৯৩৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করে। তন্মধ্যে একজন মাত্র তৃতীয় বিভাগ এবং বাকী সবাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ন হন। অবিভক্ত বাংলায় সেরা প্রধান শিক্ষকের সেরা স্কুল হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তখন খুশীর আনন্দের বন্যায় প্রধান শিক্ষক একদিন স্কুল ছুটি ঘোষণা করেছিলেন।

সে সময় বগুড়ায় বিভিন্নজন বলতেন–বগুড়া শহরে দুইজন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আছেন–একজন জেলা প্রশাসন অপর জন জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার। শ্রদ্ধাভাজন এ প্রধান শিক্ষক ১৯৪০ সালে অবসর গ্রহণ করেন । তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাই স্কুলে ১০ বছর এবং পরবর্তীতে মালদহ জেলা স্কুল ও বগুড়া জেলা স্কুলে ১৪ বছর ৭ মাস চাকুরি করেছেন। পেনশন গণনার ক্ষেত্রে সরকার পূর্ববর্তী চাকুরি গণনা করেনি। শুধুমাত্র ১৪ বছর চাকুরির উপর তাঁর পেনশন ধার্য করা হয় এবং আমরণ পেনশন গ্রহণ করেন।

উত্তম মানুষ গড়ার কারিগরের শিক্ষায় দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত অনেক আদর্শবান মানুষ তৈরী হয়েছে। তন্মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জাকির হোসেন খান চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাই স্কুলে তাঁর স্নেহধন্য ও আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র ছিলেন। আজীবন তিনি তাঁর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককে স্মরণ করেছেন। তাই দেখা যায় জাকির হোসেন খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর থাকা কালে একবার রাষ্ট্রীয় সফরে বগুড়া যান। তখন জেলা প্রশাসক সাজ্জাদ আলী মজুমদারকে বলেন–বগুড়ার খান সাহেব মোবারক আলী আমার শিক্ষক। আমি প্রথমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবো। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবো। ডি সি সাহেব একথা শুনে নিজেই আগাম সংবাদ নিয়ে খান সাহেবের বাড়ি চলে যান। তখন তিনি খেতে বসেছেন। ডিসি সাহেব বৈঠক খানায় অপেক্ষা করতে থাকেন। এমন সময় গভর্ণর এসে উপস্থিত হন। তিনি বাড়ির ভিতরে খান সাহেবের নিকট চলে যান। খাবার টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে স্যারকে সালাম জানান। নিজের পরিচয় দেন। স্যারের কুশলাদী জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁর এই প্রতিষ্ঠিত ছাত্রটিকে কাছে পেয়ে প্রাণটা ভরে যায়। পাশে বসে খাবার খেতে বলেন। খান সাহেবের সহধর্মীণিও খাবার বেড়ে তাঁকে খেতে বলতে থাকেন। অবশেষে স্নেহধন্য ছাত্র শিক্ষক গুরুর আদেশ পালনে শত ব্যস্ততার মাঝেও পাশে বসে খাবার খান। প্রাণবন্ত আলাপ হয়। পরদিন এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি দৈনিক অবজারভার পত্রিকার শিরোনাম ছিল Govornor Pays Homage to His Teacher। তিনি ছাত্রদের কাজে শুধু শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি কখনও শিক্ষক, কখনও অভিভাবক, আবার কখনও বন্ধুসুলভ ব্যবহার করেছেন। স্কুলের বাইরেও ছাত্রদের সাথে মিশতেন। উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ধর্মপরায়ণ আদর্শ মানুষ হবার উপদেশ দিয়েছেন। তাই তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ অনেকের জীবন চলার পথে পাথেয় ছিল।

বগুড়া জেলা স্কুলে তাঁর এক ছাত্র ছিলেন তাজমিলুর রহমান। তিনি ১৯৪০ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন এবং কর্মজীবনে ১৯৭১ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বগুড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের স্মরণে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পত্রস্থ করা হল :–

সে আজিকে হল কত কাল তবু মনে হয়
যেন সেদিন সকাল

আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগের আমার শৈশব কৈশোরের সন্ধিক্ষণে স্কুল জীবনের স্মৃতি আজও চির অম্লান। বস্তুত: শৈশবের প্রস্তুতি পর্বে ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় সংগ্রহের বগুড়া জেলা স্কুলের ভূমিকা অনন্য। জীবন সায়হ্নে এসে প্রতি মুহূর্তে যখন মৃত্যুর প্রহর গুনছি সে সময়ে বগুড়া জেলা স্কুলের কৈশোরের স্মৃতি আমার কাছে এত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে যে তার কোন কিছুই ভুলবার নয়। এই স্কুলের সেই সময়ের ছাত্র এবং শিক্ষকগণের কাছে যিনি ধ্রুব তারার জ্যোতি নিয়ে অবস্থান করতেন তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক খাঁন সাহেব মোবারক আলী। আজও যাঁর নাম স্মরণ করলে আমার হৃদয় মনে যে ভীতি এবং প্রেরণার সঞ্চার হয় তার বর্ণনা দেওয়া ভাষায় সম্ভব নয়।

মনে পড়ে আমার পিতা একদিন সকালে আমার হাত ধরে মফ:সলের এক গ্রাম থেকে বগুড়া শহরে সূত্রাপুর মহল্লায় নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে ছিল খান সাহেব মোবারক আলীর বাসা। বাবা আমাকে নিয়ে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করছেন। এর মধ্যেই হেড মাষ্টার ভেতর বাড়ী থেকে ড্রইং রুমে এসে হাজির হলেন। বাবা তাঁর কাছে আমার ভর্তির ব্যাপারে আরজি পেশ করলেন এবং অনেক আলাপ আলোচনা ও হ্যাঁ এবং না করার পর বাবাকে পরদিন সকাল দশটায় স্কুলে হাজির হয়ে ছেলেকে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিত করার পরামর্শ দিলেন। এখানে একটা বিষয় আমার তখনকার শিশু মনে গ্রথিত হয়ে গেল এবং তা হল এই যে, হেড মাষ্টার মহোদয় যতক্ষণ বাবার সঙ্গে কথা বললেন তিনি চেয়ারে বসেই তা করলেন। কিন্তু বাবাকে পাশ্ববর্তী চেয়ারে বসতে বলা সত্ত্বেও তিনি বসলেন না এবং সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে হেড মাস্টারের সঙ্গে কথা বললেন। আমি বুঝলাম যে হেডমাস্টার আমার বাবার থেকেও অনেক বড়। এইজন্যই বাবা দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং হেডমাস্টার চেয়ারে বসে কথা বললেন।

পরদিন স্কুলে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম এবং পরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেলাম। ফলে ১৯৩৫ থেকে আমি বগুড়া জেলা স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলাম এবং ১৯৪০ সনে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তখনকার দিনে বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০০/৩৫০।

(চলবে)

সংবাদ

আসিরানে রাহে মাওলা

৭নং সরল ইউনিয়ন, বাঁশখালি জেলা চট্টগ্রাম। গত সপ্তাহের মতো ১৪/১০/২০১১ তারিখেও নও মোবাইন সদস্যদের সাথে নিয়ে জুমুআর নামায পড়ার জন্য সদর মুরব্বী মওলানা আব্দুল মতিন, জনাব সৈয়দ আমিন আহমদ, জনাব শাহাবুদ্দীন খালেদ এবং জনাব মোহাম্মদ আলী সেখানে যান। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে একদল মোল্লা তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে এবং অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে থাকে। এক পর্যায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের দপ্তরে। সেখানে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে আরো জঘন্য সব গালিগালাজ সহ মৃত্যুভয় দেখানো হয় অবশেষে তাঁদেরকে থানায় সোপর্দ করা হয় জঙ্গি সন্দেহে এই সাথে জব্দ করা হয় 'মহাসুসংবাদ, জামা'তি কিছু লিটলেট, বয়আত ফর্ম ও একটি কুরআন শরীফ। মহান আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী ভয়কে আশাতে রূপান্তরিত করা হয়। জব্দকৃত বইগুলোই তাঁদের শক্তির কারণ হয়ে যায়। মাঝখান থেকে দুই রাত্রি চট্টগ্রাম কারাবাসে কাটাতে হয়। সামান্য এই কুরবানীটা আমাদের জন্য অনেক রহমতের কারণ হয়েছে এবং আরো অনেক কল্যাণের হাতছানি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আমীর,
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ১৭তম বার্ষিক ইজতেমা ২০১০-২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ রোজ শুক্র ও শনিবার দুই দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার ১৭ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা তবশীর রুবী। ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমাতুল কাইয়ুম, নায়েব সদর-১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত ও আহাদনামা পাঠ করা হয়। এরপর আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা, উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। ভাষণে তিনি তরবিয়তের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

দু'দিন ব্যাপী এই ইজতেমায় বক্তৃতা, নযম, কাসিদা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। বক্তৃতার বিষয়গুলো হচ্ছে–ওসীয়্যত কেন করবো, বিবাহ ও জীবন, মহানবী (সা.)-এর চরিত্র, মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ, আহমদীয়াতের অনন্য বৈশিষ্ট্য খিলাফত। ইসলামে নারীকে দেয়া নির্দেশ ও নারীর সম্মান ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তব্য। এছাড়া হালকা পর্যলোচনা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা বাৎসরিক কার্যক্রমের রিপোর্ট ও বাৎসরিক অর্থ রিপোর্ট পেশ করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে ইশরাত জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিশেষে ইশরাত আইন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্। ঢাকা সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তির ঘোষণা করেন। উক্ত ইজতেমায় দু'দিনে ৪৬৭ জন লাজনা এবং ৮৩ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

সেলিনা তবশির রুবী

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"।**

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ নভেম্বর ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার দপ্তরে একজন খাদেম নিয়োগের জন্য আহমদী প্রার্থীদের নিকট থেকে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যুনতম এস, এস, সি পাশ। স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট এর সুপারিশসহ আমীর, ঢাকা জামাত বরাবর লিখিত আবেদনপত্র আগামী ২৫/১১/২০১১ তারিখের মধ্যে ঢাকা জামা'তের দপ্তরে পৌঁছতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 8th Issue
Fortnightly
The Ahmadi
31 October, 2011
Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com